KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : পৌষ, ১৩৬৫ ফাল্গুন, ১৩৬৫ চৈত্র, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

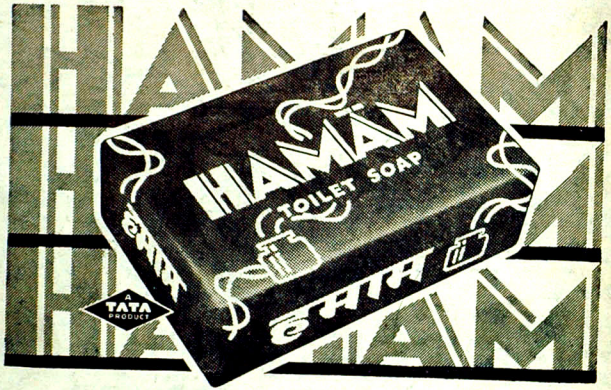

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 March '59 (0.50) SAMAKALIN

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ

চৈত্র ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

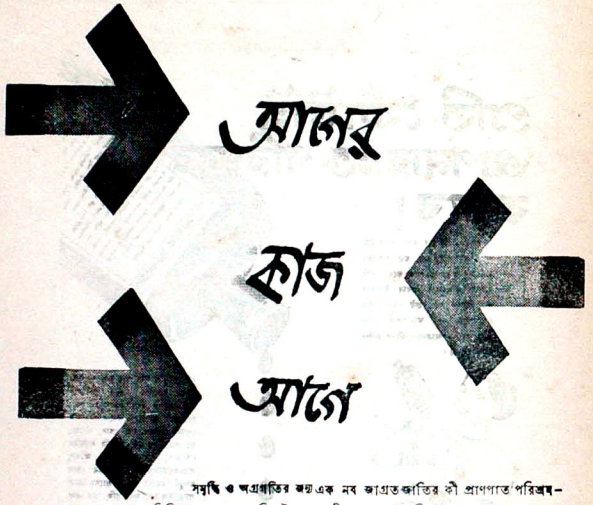

সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য এক নব জাগ্রত জাতির কী প্রাণপাত পরিশ্রম—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত কিছুই না করণীয় রয়েছে। কিন্তু আগের কাজ আগে, নইলে শুধু বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হ'বে।

আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের বিচারে প্রথম হ'ল শিল্প। তাই এ দেশের রেলপথ তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র ও পরিকল্পনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। আমাদের পরিবহন ক্ষমতার উপর দ্রব্যসম্ভার ও যাত্রিসাধারণ উভয়ের চাপই অত্যধিক, কিন্তু আগের কাজ আগে—তাই দ্রব্যসম্ভারকেই আগে সুযোগ দিতে হবে।

তীব্রতর চাপে কিছু যাত্রিসাধারণকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করতে পারি মাত্র।

পূর্ব রেলপথ

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ চৈত্র ॥ ১৩৬৫

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ॥ পদাবলীর চিত্রকল্প। রণেন্দ্রনাথ দেব ৭০৮
জীবনরসিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ৭২৮
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরেন ঘোষ ৭৩৯
অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৭২২
উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩৩
আলোচনা ॥ বাংলার ইতিহাস। সোমেন বসু ৭৪২
মার্কিন ক্ষুদ্র শিল্প-প্রদর্শনী। নির্মলেন্দু সান্যাল ৭৪৩
সমাজ সমস্যা ॥ বিকেলের আলো। অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৭৪৬
সমালোচনা ॥ রথীন্দ্রনাথ রায়। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৭৪৮

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

উ ল্লে খ যো গ্য ব ই ও প ত্র প ত্রি কা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তসার) দাম ঃ এক টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তবিবরণী) দাম ঃ ছয় আনা

॥ ছো ট দে র জ ন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা

মনোজিৎ বসু

দাম ঃ এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গুঞ্জন

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ছুটির দিনের কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেল-নুন-কড়ি

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

চলার পথে—বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জয় যাত্রা—নীলিমা সেন

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

দামোদর

বিশ্ব বিশ্বাস

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

হাতের কাজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

আমাদের পতাকা

দাম—পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েস্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১·৫০ টাকা;

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগরেবী বংগাল

উর্দুভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাব্‌লিকেশন্‌ সেল্‌স-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) **প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার**, রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা ১

ষষ্ঠ বর্ষ সমকালীন চৈত্র ॥ ১৩৬৫

পদাবলীর চিত্রকল্প

রণেন্দ্রনাথ দেব

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য সহস্র সহস্র পদ নিয়ে গঠিত। এসকল পদের সংখ্যা প্রচুর হলেও এদের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য অল্প। একই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায়, কয়েকটি বিশিষ্ট উল্লাসময় ও বেদনাকর অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তা সীমাবদ্ধ। সেই কারণে বৈষ্ণব কবিরা যেসকল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন তারও মধ্যে সমজাতীয়ত্ব আছে। যেন একই ধরণের চিত্রকল্পনা (Pictorial imagination) নানা কবির মধ্যে কালে কালে স্ফুরিত হয়েছে। এর কিছুটা নিশ্চয়ই কবিদের মধ্যে পরীক্ষা-প্রবণতার অভাব ও গতানুগতিকত্বে সন্তুষ্ট থাকার ফল। কিন্তু যে-বিষয়বস্তু তাঁদের সকলের উপজীব্য, যে কৃষ্ণপ্রেমের আধারে তাঁদের সকল ধ্যানের পরিসমাপ্তি তাতে নিত্য নব বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ খুব বেশি ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। আলঙ্কারিকদের ব্যবহৃত একটি উদাহরণের উল্লেখ করে বলা যায় স্ফটিকখণ্ড যেমন জবা প্রভৃতি নানাবস্তুর সংস্পর্শে এসে নানা-বর্ণ ধারণ করে, তেমনি পদাবলীতে চিত্রকল্পের যেটুকু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তা বিভিন্ন কবিমানসের পৃথক পৃথক বর্ণের দ্বারা অনুরঞ্জিত মাত্র।

পদাবলীর চিত্রকল্পসমূহের বিশিষ্টতা বুঝতে হলে কবিরা কোন্‌ কোন্‌ উপমা ব্যবহার করেছেন দেখা দরকার। যেসকল দৃশ্যবস্তু পদসাহিত্যের উপমা ও বর্ণনার ভিত্তিনির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের দ্বারাই কবিদের চিত্রকল্পনার প্রসার ও বৈচিত্র্য পরিস্ফুটিত হবে। সন্দেহ নেই, যেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তেমনি পদাবলীতেও উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ ও অনুজ্জ্বল। দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শনের দ্বারা যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হতে পারে পুনরুক্তির ফলে তা আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। পদকর্তারা সচরাচর কি ধরণের উপমা প্রয়োগ করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিদ্যাপতি বলছেন

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
    চললিহু সংকেত গেহা
অমলা তড়িত দণ্ড হেমমঞ্জুরি
    জিনি অতি সুন্দর দেহা।
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
    অলকাভৃঙ্গ সৈবালে

ভাভুলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনি
    জিনি আধ বিধুবর ভালে ।
নলিনি চকোর সফরিবর মধুকর
    মৃগি খঞ্জন জিনি আখী
নাসা তিলফুল গরুড়চঞ্চু জিনি
    গিধিনি স্রবণ বিসেখী ।

কনক-মুকুর সসি কমল জিনিয়া মুখ
নিজি বিম্বু অধর পঙারে
দসন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ বীজ
জিনি কম্বু কন্ঠ আকারে ।
বেল তাল জুগ হেম-কলস গিরি
কটোরা জিনিআ কুচ সাজা
বাহু মৃণাল পাস বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ।

লোমলতাবলী সৈবল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গ নিরঙ্গা
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিআ গজকুম্ভা ।
উরুজুগ কদালি করিবর জিনি
স্থূল পঙ্কজ জিনি পদপানী
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়াবাণী।

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে এইসব উপমা পাওয়া যায়। গমনের সঙ্গে করিবর ও রাজহংসীর ভঙ্গির; দেহবর্ণের সঙ্গে নির্মল বিদ্যুদ্দন্ড ও হেমমঞ্জরীর; কুন্তলের সঙ্গে মেঘ, অন্ধকার ও চামরের; অলকের সঙ্গে মধুকর ও শৈবালের; ভ্রূর সঙ্গে কন্দর্পের ধনু, মধুকর ও সর্পের; ললাটের সঙ্গে অর্ধচন্দ্রের; চোখের সঙ্গে কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জনের; নাসার সঙ্গে তিলফুল ও গরুড়চঞ্চুর; মুখের সঙ্গে স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র ও কমলের; অধরের সঙ্গে বিম্বফল ও প্রবালের; দন্তের সঙ্গে মুক্তা, কুন্দ ও দাড়িম্ববীজের; কন্ঠের সঙ্গে শঙ্খের; স্তনের সঙ্গে বেল, তালযুগল, স্বর্ণকলস, গিরি ও কটোরির; বাহুর সঙ্গে মৃণাল, বল্লরী ও পাশের; কটীর সঙ্গে ডমরু ও সিংহের; রোমাবলীর সঙ্গে শৈবাল ও কজ্জলের; ত্রিবলীর সঙ্গে তরঙ্গিণীর; নাভির সঙ্গে সরোবর ও পদ্মের; নিতম্বের সঙ্গে হস্তিকুম্ভের; উরুদ্বয়ের সঙ্গে কদলী ও হস্তি শুন্ডের; পদ ও হস্তের সঙ্গে স্থলকমলের; নখের সঙ্গে দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র ও রত্নের এবং বচনের সঙ্গে কোকিল ও অমৃতের তুলনা করা হয়েছে। একশোটি বৈষ্ণবপদ পড়লে এই সব উপমাই আমরা ঘুরেফিরে পাই। বিদ্যাপতি একটি পদে যে-সব উপমা সংগৃহীত করেছেন নানা কবি তাকে বিস্তারিত করেছেন মাত্র (বিদ্যাপতির উপমাভান্ডারও সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়)। বড় জোর এরই মধ্যে কোনো কোনো কবি একটু স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করতে পারেন বলবার ভঙ্গি সামান্য বদলে দিয়ে, যেমন হয়েছে রায় শেখরের এই পদটিতে

কবরীভয়ে চমরী গেও গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে ।

কিংবা চন্ডীদাসের পদে

কম্বু জিনিয়া কেবা কন্ঠ বানাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বানাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ।

এগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন উপমারই রূপান্তর। সামান্য পরিমার্জনের দ্বারা পুরাতন উপমাতে কিছুটা নূতন ব্যঞ্জনা আনা হয়েছে। চন্ডীদাসের আরো একটি পদে এর উদাহরণ দেখানো যায়। কৃষ্ণের দেহের সঙ্গে কাজল ও মেঘের উপমা সুপ্রসিদ্ধ। কবি এই কথাটিই বলেছেন অন্যভাবে

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তাজিয়াছি কাজরের সাধ ।

কেশের সঙ্গে চামরের ও দশনের সঙ্গে মুক্তার তুলনাও বহু প্রচলিত। গোবিন্দদাস এই উপমাটিতে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ।

ভঙ্গির অভিনবত্বটুকু বাদ দিলে এসব পদে চিত্রকল্পনার কোনো অভিনবত্ব ধরা পড়ে না। কিন্তু

কবি যদি রাধার নাসিকার তুলনা দিতে গিয়ে তিলফুলকে ত্যাগ করে বলেন

নাসিকা গালিকযন্ত্র সমানে । (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

অর্থাৎ 'নলাকার যন্ত্রের ন্যায়', তখন একটি নূতন চিত্র দেখা দেয়। বলাবাহুল্য এরকম নূতন ধরণের উপমা পদাবলী সাহিত্যে সুলভ নয়। কবিরা পুরাতন উপমা-সম্ভারই বারংবার ব্যবহার করেছেন, অধরকে বলেছেন প্রবালতুল্য, নারী যেন হরিণী, মদন ব্যাধ, অঙ্গ শিরীষ ফুলের মতো কোমল, একজনের মুখ চন্দ্র অপরের নয়ন চকোর, কিংবা সুন্দরী যেন স্বর্ণলতা—কনকলতায়ে যৈছে বেঢ়ল তমাল। বড় কবি পুরাতন ভান্ডারকেই নূতন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে চলেন। পায়ের সঙ্গে পদ্মের তুলনা বিদ্যাপতির পদে হলো এইরকম

জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরঈ ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ ।

কিংবা আর একটু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে কবি বলেছেন রাধার কাছে কৃষ্ণই সর্বস্ব, যেন

হাতক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ।
হৃদয়ক মৃগমদ শীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার ।

বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে যেকথা সত্য অন্য কবিদের ক্ষেত্রেও তাই। সর্বজন পরিচিত কয়েকটি দৃশ্যবস্তুকে কবিরা নানা উপায়ে প্রয়োগ করে গেছেন।

২

রাধা এবং কৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বৈষ্ণবকাব্যের উপজীব্য তার প্রথম স্তর পূর্বরাগ। পূর্বরাগের পটভূমিকা রচনা করেছে পরস্পরের রূপবর্ণনা। কবিরা অক্লান্ত উৎসাহে অজস্র উপমার দ্বারা রাধা ও কৃষ্ণের দেহগত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপমাগুলির উৎস দুটি প্রকৃতিজগৎ ও মানব জগৎ। কবিরা প্রকৃতিজগতের ফুল, লতা, বৃক্ষ, মেঘ প্রভৃতি থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি প্রাণীদের কথাও বিস্মৃত হননি। আবার একই বস্তু যেমন পাখি কিংবা চাঁদ কিংবা মেঘ সবসময় একই আবেগের স্ফুটনে ব্যবহৃত হয়নি। এদের একাধিক ব্যঞ্জনা আছে। কোন্ কোন্ বস্তুর উল্লেখ সবচেয়ে বেশি পাই তার হিসাব নিলে কবিদের কল্পনার বিচরণপথটি স্পষ্ট হবে। যেমন বলা যায় পদ্মের কথা। একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে পদাবলীতে পদ্মের মতো আর কোনো ফুল এত ব্যাপকভাবে উদাহৃত হয়নি। বিদ্যাপতি বলেছেন

অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ
মধুরী ফুলে পূজু অরবিন্দ।

রক্তিম অধর দেখে মনে হয় যেন বাঁধুলি ফুলে পদ্মের পূজা করা হলো। মুখ এখানে পদ্ম। চোখের বর্ণনা প্রসঙ্গে পদ্মের উপমাটিকে কবি সামান্য পরিবর্তিত করে বললেন— এক কমল দুই খঞ্জন খেল। এক পদ্মে দুটি খঞ্জন খেলা করছে। পদ্ম এবং মৃণাল শুধু মুখ নয়, রাধার দেহের পেলব নমনীয়তা বোঝাতেও প্রযুক্ত হলো। কৃষ্ণের উন্মত্ত আবেগের কাছে রাধা অসহায়, যেন হাতীর শুঁড়ে পদ্মনাল, হাথি হাথ জনি পড়লি পঙোনারি। আবার রাধা যখন বেদনায় মলিন তখনও পদ্মের উপমা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে-পদ্ম তুষার খিন্ন

যৈছন তুহিন বরিখে রজনী
করকমল না সহ এ পরাণে। —বিদ্যাপতি।

রাত্রির বরফপাতের পর পদ্ম যেমন সামান্য করস্পর্শও সহ্য করতে পারেনা এবং

তো বিনু সুন্দরী ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনীপর পালা। —বিদ্যাপতি।

তোমার বিরহে সুন্দরীর অবস্থা সেরকম নলিনীর উপর বরফপাত হলে যেমন হয়।

পদ্মের পরেই উল্লেখযোগ্য ফুল বান্ধুলী। ওষ্ঠাধরের রক্তিমাভা বোঝাতে বান্ধুলীর দৃষ্টান্ত বারবার দেওয়া হয়েছে। এটির প্রয়োগ মূলত আনন্দের উজ্জ্বলতা বোঝাবার জন্য। কিন্তু রাধার বিমর্ষ মুখচ্ছবি বোঝাতে কবি দ্বারস্থ হয়েছেন অন্য ফুলের। তখন

অরুণ অধর বান্ধুলি তুল
পান্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ।—জ্ঞানদাস।

যেমন পদ্মফুল, যেমন বাঁধুলি, তেমনি লতাও রাধার অন্য উপমান। বিদ্যাপতি রাধাকে বলেছেন দ্রোণলতার মতো। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মূর্তি হচ্ছে কনকলতাবেস্টিত শ্যামল তমাল তরু। এখানে কৃষ্ণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলিত হলেন। আবার বৃক্ষের সঙ্গে সমগ্র প্রেমক্রিয়ারও তুলনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতির পদে রাধা বলছেন প্রেমতরু আপনা আপনি বেড়ে উঠে সৌরভ দশদিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে

সাখা পল্লব কুসুম বেআপল
সৌরভ দহদিস গেলা।

কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা রাধা এই প্রেমকেই বলেছেন বিষবৃক্ষ কিংবা তালবৃক্ষের ছায়ার মতো

তৃণতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহু
জইসন উচিত সে ভেলা ।— বিদ্যাপতি।

তালবৃক্ষের ছায়ায় বসে উচিত ফল পেলাম অর্থাৎ উত্তাপে দগ্ধ হতে হলো। শুধু ফুল, কিশলয় কিংবা বৃক্ষ নয়, কখনো কখনো সমগ্র বনপ্রকৃতিই উপমানে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রেমের গহন জটিলতাকে জ্ঞানদাস একটি পদে চমৎকার প্রকাশ করেছেন

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

ফুলের প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রাণিজগতের কথা। বৈষ্ণব কবিরা কতরকম পাখি ও পশুর উল্লেখ করেছেন দেখা দরকার। মুখকে যখনই কবিরা পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন চোখকে বলেছেন ভ্রমর কিংবা খঞ্জন। লক্ষ্য করতে হয় গতি কিংবা চাঞ্চল্য বোঝাবার জন্যই পাখি কিংবা অন্য প্রাণীর অবতারণা করা হয়েছে বিশেষভাবে।

চোখের সঙ্গে খঞ্জনের তুলনা খুব ব্যাপক। বিদ্যাপতি মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করে চোখ দুটিকে বলেছেন খঞ্জন— চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল, চহক চহক রবে খেলা করছে। বড়ু চন্ডীদাস বলেছেন

আঞ্চল চঞ্চল তোর খঞ্জন নয়নে
আর্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে।

খঞ্জনের চটুলতার সঙ্গে দৃষ্টির চাঞ্চল্যের মিল থাকলেও কবিরা এতে তৃপ্ত হননি। অন্যবিধ দৃষ্টিও আছে, তার জন্যে ভিন্নতর উপমান প্রয়োজন। যে দৃষ্টি রসের গভীরে নিমজ্জিত তার তুলনা খঞ্জন নয়, মধুকর। বিদ্যাপতির একটি সুবিখ্যাত পদে ভ্রমরের উপমা পাচ্ছি

মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি।

মাধবের মুখ থেকে রাধা চোখ সরাতে পারলেন না, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমর যেমন ইচ্ছা করলেও পক্ষবিস্তার করতে পারেনা। বিদ্যাপতি আরেকবার ভ্রমরের উপমা দিয়েছেন রতিশ্রান্ত কৃষ্ণের মূর্তি আঁকতে গিয়ে—মধু পিবি মধুকর সুতল সরোজে। রাধার দেহসৌরভে লুব্ধ কৃষ্ণ ভ্রমরের মতো ঘুরে বেড়ান।

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে।— গোবিন্দ দাস।

কিন্তু মধুকর যেমন রসসন্ধানী তেমনি বহু নিষ্ঠও বটে। বৈষ্ণবকাব্য তাই ভ্রমরের অন্য ব্যঞ্জনা

পুরুষের অবিশ্বাসিতা,

পুরুষ ভমরসম কুসুমে কুসুমে রস
পেঅসি করএ কি পারে।— বিদ্যাপতি।

পুরুষ ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ালে প্রেয়সী কি করতে পারে?

পক্ষী-পতঙ্গের মতো মাছও পদাবলীর একটি বহুপ্রচলিত উপমা। বিদ্যাপতির পদে আছে

পাখীক পাখ মীনক পানি।

পাখির পক্ষে যেমন পাখা, মাছের পক্ষে যেমন জল, রাধার পক্ষে তেমনি কৃষ্ণই সব। মাছের চিত্র কবিরা অন্যভাবেও এঁকেছেন। নরহরিদাস রাধার সর্ববাধাতুচ্ছকরা প্রেমের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন প্রথম বর্ষার জলে উজিয়ে ওঠা মাছের মৃত্যুভয় যে ভুলে গেছে

নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে
শ্যাম অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে।

আবার, সংসারের শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে অশান্ত হৃদয়ের প্রতীকও মাছ

অগাধ সলিলে মীন মরয়ে পিয়াসে। — নরোত্তম দাস।

প্রাণিজগৎ থেকে গৃহীত অন্য ক'টি উপমান হচ্ছে হরিণী, সিংহ ও হস্তী। রাধার কটি দেশের ক্ষীণতা সিংহের অনুরূপ

যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ
ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ।— বলরাম দাস

রাধা যখন ভয়ত্রস্তা তখন তিনি হরিণীর মতো। জ্ঞানদাস লিখেছেন

হরিণা পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।

এই উপমা অন্যরূপেও পাওয়া যায়, যেমন চন্ডীদাসের 'পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে, অথবা

বিষাইল কান্ডের ঘায়ে যেহেন হরিণী। — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

স্তনের সঙ্গে গজকুম্ভের ও হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ের তুলনা আছে এবং মদমত্ত হাতীর সঙ্গে যৌবনের আবেগ প্রাবল্যের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে

এ নব যৌবন বড়ায়ি মরমত্ত করী
লাজ আঙ্কুশে তাক নিবারিতে নারী।— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কিন্তু পদাবলীতে সবচেয়ে চমকপ্রদ জৈব উপমান হলো সাপ।

শরীরের কোনো কোনো অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্যই সম্ভবত প্রথম সাপের উপমা প্রযুক্ত হয়। বিদ্যাপতির পদে আছে

নাভিবিবর সঞে লোম লতাবলী
ভুজগি নিশ্বাস পিয়াসা।

নাভিবিবর থেকে লোম লতাবলী বার হয়েছে, যেন ভুজঙ্গিনী নিঃশ্বাস নেবার জন্য বাইরে এলো। রোমের এই বর্ণনা অন্যান্য কবিরাও গ্রহণ করেছেন

রোমলতাবলী ভুজগীভাণ
নাভি সরোবরে করু পয়ান।— জ্ঞানদাস।

নাভি সরোবরে লোম ভুজগিনী
বিহরে কুচগিরিকোর রে।— বলরামদাস।

রোমাবলী ছাড়া বেণীরও উপমান সর্প। বিদ্যাপতি কুচের ওপর লুন্ঠিত বেণীকে দেখে বলেছেন যেন কৃষ্ণসর্পিণী স্বর্ণগিরিতে শুয়ে আছে

কলসকুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেণী

কনয় পরয় সুতলী
জনি কারি নাগিনী।

প্রায় একই রীতিকে কৃষ্ণবেণীর সৌন্দর্য স্বর্ণকুণ্ডলের পালে প্রতিস্থাপন করে দেখিয়েছেন গোবিন্দদাস

কুণ্ডলচক্র বিকাশে
বেণীভুজঙ্গিণী পাশে।

সাপের কৃষ্ণকের চিকণ সৌন্দর্যের সঙ্গে ভ্রূ, রোমলতা ও বেণীর তুলনা সার্থক ও সুপ্রযুক্ত সংশয় নেই। কিন্তু সাপের অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য, তার তীব্রতা ও কুটিল গতিভঙ্গি, এজাতীয় উপমায় প্রাধান্য পেয়েছে। রাধা কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হলে কবি লিখলেন

কুচযুগ পরসিতে মোড়ই অঙ্গ
মন্দ না মানে জনু বাল ভুজঙ্গ। —বিদ্যাপতি?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও গর্বভরে বলেছিলেন

আক্ষার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলে খাইলে মরী।

কিন্তু রাধার এই দর্পোক্তির উত্তর কৃষ্ণ সাপেরই আরেকটি উপমার সাহায্যে দিয়েছেন

এথাসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ
তথা গেলে হইবি যেহ্ন বাদি আর সাপ।

পদাবলীতে সাপের আরেক রকম চিত্র আছে। সেখানে সাপ শুধু বিশেষ একটি অঙ্গের অনুরূপ কিংবা মানবভাবের বিশেষ একটি গুণের প্রতীক নয়। রাধা ও কৃষ্ণের সমগ্র ব্যক্তিই যেন সর্পধর্ম প্রাপ্ত হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করে বলছেন

কাজর ভরম তিমির জনু তনুরুচি বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
নিবসই কুঞ্জকুটীর গতি অতি কুটিল সুধীর।
সজনি, কানু সে বরজভুজঙ্গ। — গোবিন্দ দাস।

আবার রাধাও সর্পিণী ধর্মযুক্তা। কালিয় দমনের পর সখী কৃষ্ণকে বলছে

মাধব অতএ কহি য়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝ লোম ভুজঙ্গিণী
হেরইতে তুহু জানি ভাগি।

নয়ন কমলপর যুগল ভুজগবর বেণী ভুজগবর পিঠপর দোলত
কাজর গরল উগারি চিরদিন ভুখিল পিয়াসে
মদন ধন্বন্তরি আপে যব আন্তর শুনইতে নাগ দমন তনু কাঁপিত
সো রিখ তবহি না সারি। কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে।

কালিয়মদন শুনে রাধার তনু ভয়ে কম্পমান কারণ তিনি নিজেই যেন নাগকন্যা। রাধার এই অনন্যসাধারণ বর্ণনাটি পড়ে গোবর্ধন-আচার্যের আরেকটি প্রসিদ্ধ পদের কথা মনে পড়ে

কিং পরজীবৈর্দীব্যসি বিস্ময় মধুরাক্ষি গচ্ছ সখি দূরম্
অহিমধি চন্দ্ররমুরগগ্রাহী খেলয়তু নির্বিঘ্নঃ।

—হে সখি, সাপখেলা দেখতে দেখতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে মধুরতর হয়েছে। অতএব কেন পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করছ। দূরে সরে যাও, প্রাণগণে সাপুড়ে নির্বিঘ্নে খেলাক। [শ্রীসুকুমার সেন কৃত অনুবাদ।]

৩

এবারে মানব-সংসার থেকে সংগৃহীত উপাদানের কথা বলবো। বৈষ্ণব কবিরা যখন জীবন-বিমুখ নন, প্রাকৃত সংসারকে অস্বীকার করে নয়, এরই মধ্যে থেকে অমর্ত্য আনন্দ লাভে প্রয়াসী,

তখন এটাই স্বাভাবিক যে এঁদের পদে সাংসারিক প্রতিবেশ ছায়াপাত করবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিত্যকর্মক্ষেত্র সংসারের পরিচিত দ্রব্যাদি থেকে বৈষ্ণব কবিরা অনেক উপমান সঞ্চয় করেছেন। নিত্যবৃন্দাবনের সৌন্দর্যলোকে প্রাকৃত চিত্রকল্পের অতর্কিত সন্নিবেশে রস হানি না হয়ে অনেকক্ষেত্রে মর্ত্যজীবনের সহজ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিদিন আমরা যেসকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করি, যেসব মানুষের সান্নিধ্যে আসি তাদের কথা কবিরা কিভাবে উল্লেখ করেছেন দেখা যাক। অনেক সময় পদকর্তারা ভোজ্যদ্রব্যের উপমা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রসাপ্লুতা রাধাকে বলা হয়েছে নবনীতের ন্যায়—লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে। এই কাব্যে অন্যত্র রাধার উষ্ণ যৌবনের উপমান তপ্ত দুধ। অতি আগ্রহী কৃষ্ণকে রাধা সতর্ক করে বললেন

তপত দুধ নালে না পী এ
জড়ায়িলে সো আদ তাএ।

দধির উপমাও আছে। রায়শেখর রাধার শুভ্র বেশের কথা বলেছেন—মাহিষ দধি রুচির বাস (রূপ গোস্বামীর পরিহিত মাহিষ দধিরুচি সিচয়া স্মর্তব্য)।

গৃহস্থালীর জগৎ থেকে সংগৃহীত আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ঘটের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বললেন

যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট
তাহার সে নেহা, যেহ্ন মাটির ঘট।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত অপর উপমার কথা স্মরণ করতে হয়। রাধা নিজের অন্তর্জ্বালার সঙ্গে তুলনা করেছেন মৃৎপাত্র পোড়াবার চুল্লীর

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।

পদাবলীতে অগ্নিসংক্রান্ত অপর একটি বিচিত্র উপমা পাচ্ছি। জ্ঞানদাস অবিরলধারে বহমান অশ্রুর চিত্র আঁকছেন উনুনে নিক্ষিপ্ত কাঁচা কাঠের তুলনা দিয়ে

পাবক পরশে সরস দারু যৈছে
একদিশে নিকসই বারি। ।

পরিচিত গৃহস্থ-সংসারের অন্য উপমান স্বর্ণ। সোনার উপমা কখনো কখনো তার দুর্মূল্যতা বোঝাবার জন্য, যেমন

অলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল
কাঞ্চন সঞে কাচ মরকত তুল। — জ্ঞানদাস।

স্বর্ণের দুর্লভতা অন্যরূপেও দেখানো হয়েছে, প্রেম যেন দরিদ্রের ঘরের সোনা দারিদঘরে বিহি ধরিথয়ে হেম।— জ্ঞানদাস!

দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান দারিদ হেম জনি তিল এক ন ছোড়য়
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরয়।— বলরাম দাস। রভসে রজনী গমাছ। — রায় শেখর।

বেরি এক দইব দহিল জঞো হোত্র
নিরধন ধন জকে ধরব মোঞে গোত্র। — বিদ্যাপতি।

—দৈব একবার প্রসন্ন হলে দরিদ্রের ধনের মতো সংগোপনে রাখবো। কিন্তু স্বর্ণের উপমা প্রকৃত সার্থকতা অর্জন করেছে রাধার দেহজ্যোতি ফোটাতে। এক্ষেত্রে সোনা শুধু দুষ্প্রাপ্য ধাতু নয়, একটি উজ্জ্বল বর্ণ। মরকত স্থলি সুতলি আছলি নিকস পাষাণে যেন পাঁচবাণে
বিরহে সে খীনদেহা কসিল কনকরেহা।— বিদ্যাপতি?

মরকত নির্মিত হর্মাস্থলে সেই বিরহক্ষীণা নারী শুয়েছিল, মদন যেন নিকষপাষাণে কনকরেখা কষেছে।

কেবল সোনা নয়, প্রেমকেই অনেক সময় সমগ্র পণ্য বিক্রয় কার্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাপতির বেশ কয়েকটি পদে পণ্যসামগ্রীপূর্ণ বিপণির উল্লেখ পাই।

সুন সুন্দরি নব মদন-পসার রোস দরসরস রাখব গোত্র
জনি গোপহ আওব বনিজার। ধএলে রতন অধিক মূল হোত্র।

সুন্দরি, শোন, মদনের নূতন দোকান ঢেকে রেখো না, বণিক আসবে, কোপ দেখিয়ে রস গোপন রাখবে, কেননা রত্ন ধরে রাখলে তার মূল্য বেড়ে যায়।

বিকলএ গেলিহু রতন আমোল
চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল।

অমূল্য রত্ন বেচতে গিয়েছিলাম। বণিক (কৃষ্ণ রতি) চিহ্নাঙ্কিত করে তার মূল্য কমিয়েছে।

দূরহি রহও মোরি সেবা
পাহিল পঢ় ঞোক উধারি ন দেবা

দূর থেকে আমার সেবা গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় (দ্রব্য) ধারে দেব না। এসকল উপমা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্পর্শযুক্ত।

প্রতিদিনকার চেনা পৃথিবী থেকে নেওয়া আরেকটি চিত্র 'মন্দির' অর্থাৎ গৃহের। রাধা মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, এই চিত্রটির তাৎপর্য, তিনি কেবল অভিসারে যাচ্ছেন না, সামাজিক সংস্কারকেও লঙ্ঘন করছেন। দ্বার, কপাট প্রভৃতি সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতীক।

কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট
গুরুজন নয়ন সকন্টক বাট। — গোবিন্দ দাস।
কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা। — গোবিন্দ দাস।
শীল লজ্জা হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়। — জগদানন্দ।

যেমন গৃহ, গৃহসামগ্রী ও পণ্যদ্রব্যের উপমা তেমনি সাধারণ মানুষের উল্লেখসমূহও লক্ষণীয়। কত বিচিত্র স্বভাবের ও বহুবিধ বৃত্তিধারী মানুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে দেখা যেতে পারে। একটি পরিচিত উদাহরণ হলো ভিক্ষুকের। কৃষ্ণের দৃষ্টি বরনারীর পেছনে পেছনে ধাবমান, কৃপণের অনুগমনকারী যেমন আশালুব্ধ ভিক্ষুক

আসা লুবধল ন তেজ এ বে
কৃপইক পাছু ভিখারি। — বিদ্যাপতি।

আবার, সময় অতিক্রান্ত হবার পর প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত বিলম্বিত ব্যক্তিরও প্রতীক ভিক্ষুক

সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাছে। — বিদ্যাপতি।

শুধু ভিক্ষুক নয়, গোবিন্দদাস আর একটি কৌতুককর উদাহরণ দিয়েছেন লোভী ব্রাহ্মণের ছবি

মধুগুড় লোভিত বাউল চিত
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত।

আর আছে ব্যাধ ও চোরের ছবি। কৃষ্ণের রূপ যেন ব্যাধ,

নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ দিয়া হাসা সুধা চার অঙ্গ ছটা আটা তার
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে আঁখি পাখি তাহাতে পড়িল। — জগদানন্দ।

চোরের উপমাটি এরকম কোনো নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত নয়। নানা ব্যঞ্জিত করতে তার প্রয়োগ হয়েছে।

যেমন, রাধার ভাবগোপনের চেষ্টাকে বলা হয়েছে 'চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে।' আবার, কৃষ্ণ নিজেই চোর, যেমন লোচনদাসের পদে

বেরোলো পাড়ার লোক চোর ঢুকেছে ঘরে না লয় মোর ঘটি বাটি না লয় মোর খুরী
চোরের গলায় ফুলের মালা ঘর মৌ মৌ করে। যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ সেই ঘরেতে চুরি।

যেসব কৃষ্ণ প্রিয়া রাত্রে দশমদণ্ডে অভিসারে বেরিয়েছেন তাঁরাও চোর

কাজর রুচিহর রয়ণী বিশালা ঘরসঞে নিকসয়ে ষৈছন চোর
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা। নিশবদ পথ গতি চললিহ থোর। — রায় শেখর।

সর্বোপরি যেসকল গুরুজন রাধার প্রেমের বিঘ্ন তাঁদেরও বলা হলো চোর,

হৃদয় মন্দির মোর কানু ঘুমাওল গুরুজন পৌর চৌর সদৃশ ভেল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি দূরহি দূরে রহু ভাগি। — গোবিন্দ দাস।

এছাড়া রোগের উপমাও পদাবলীতে বিরল নয়। নায়ক চুম্বন করতে চাইলে নায়িকা মুখ নিচু করে রইলেন — রোগী করয়ে যৈছে ঔষধ পান (বিদ্যাপতি?)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে

বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল
জরুআ দেখিআ যেহ্ন রূচক আম্বল।
চান্দ যেন ঢর ঢর বহে যমুনায়।

অথচ, যখনই কোনো বিষণ্ণ পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে এই চাঁদের উপমাই সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। রাধিকা কম্পিত মুখ গোপন করলেন, জ্ঞানদাস বলছেন—বাদরে শশী জনু বেকত না হোই। প্রায় অনুরূপভাবে গোবিন্দদাসের পদে বলা হয়েছে

নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে ষৈছে চান্দকলা মেঘে গরাসল
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস নিরখই গোবিন্দ দাস।

বিরহখিন্না রাধাও চাঁদের মতো, কিন্তু সে চাঁদ চতুর্দশী তিথির

মলিনতা ধরলু বয়ান। — জ্ঞানদাস। ও নিতি চাঁদ কলা সম ক্ষীয়ত
চৌদশী চাঁদ সমান তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক। — গোবিন্দ দাস।

ক্ষীণচাঁদ অবশ্যই প্রেমের ক্ষয়সূচক, কেননা বিদ্যাপতি বলেছেন সুপুরুষের প্রেম 'দিনে দিনে চন্দকলা সম বাঢ়'।

পদাবলীতে চন্দ্রের এই ব্যঞ্জনা-পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে 'শরদচন্দ' রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলার চিরাভ্যস্ত সহচর, রাসের কালে গোপীদের কাছে যে চন্দ্র কৃষ্ণের মতনই অপরিহার্য, অভিসারের দিনে তাকেই আবার বৈরী বলে মনে হয় রাধার।

প্রথম প্রহর নিসি জাউ তম মন্দিরা পিবি মন্দা
নিজ নিজ মন্দির সুজন সমাউ। অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা। — বিদ্যাপতি।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হলে সুজনেরা যাঁর যাঁর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তমোমদিরা পানে মত্ত হয়ে মন্দ চন্দ্র এখনি উদিত হবে। বিদ্যাপতির অন্য একটি পদে পূর্ণিমায় সারা রাত্রি জ্যোৎস্না দেখে রাধা ভাবছেন কাল থেকেই আঁধার হবে, অভিসারের বাধা থাকবেনা। পূর্ণচন্দ্র এস্থলে নিন্দিত বস্তু।

এই প্রসঙ্গে তারা ও প্রদীপের উপমাগুলির কথাও বিবেচ্য। গোবিন্দদাস রাধার অলঙ্কারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন 'হার কি তারকা দ্যোতিক ছন্দ'। কবিরা আরো বলেছেন প্রদীপের কথা। জ্ঞানদাসের পদে রাধা আক্ষেপ করে ভাবছেন তিনি কার্ত্তিক মাসে আকাশ প্রদীপের মতো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

হম কুলবতী কুলকণ্টক ভেল
কাতিয় রাতি দীপ জনু দেল।

নিষ্ফলতা বোঝাতেও দীপের প্রয়োগ রয়েছে, যেমন গোবিন্দ দাসের 'কিয়ে করব কুল দিবস দীপ-তুল' কিংবা বিদ্যাপতির যদি তোহে' বরিষব সময় উপেখি
কী ফল পাওব দিবস দীপ লেখি।

এই সকল চিত্রের মধ্যে বিনা দ্বিধায় বলা চলে ঋতু চিত্রগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় কাব্যের একটি পুরাতন ঐতিহ্য ঋতুপ্রীতি। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিরা কোনো রীতিগত অভিনবত্বের সূচনা করেন নি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বাতাবরণ রচনায় এই ঋতুচক্র কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা প্রয়োজন। বিদ্যাপতির একটি সুবিখ্যাত পদে আছে

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।

এখানে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা তিনটি ঋতুর কথা আছে। কিন্তু কবিরা বিশেষভাবে বলেছেন শরৎ বসন্ত ও বর্ষার কথা। 'ঋতুপতিরাজ বসন্ত'-কে অভ্যর্থনা করে বিদ্যাপতি লিখেছেন এই ঋতু 'সময়ক সার'। বসন্তের এরূপ বন্দনা বৈষ্ণবকাব্যে প্রচুর পাওয়া যায় কেননা বসন্ত সম্ভোগাত্মা মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। শরতের চিত্র কয়েকটি পদে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার বিলাপোক্তিতে আছে আশিন মাসের শেষে নিবাড় বারিষী
মেঘ বহিআ গেলে' ফুটিবেক কাশী। (অর্থাৎ কাশফুল।)

শরৎ ও বসন্তের ফাঁকে ফাঁকে শীতের ছবিও একান্ত দুর্লভ নয়। গোবিন্দদাস লিখছেন

পৌষিনী রজনী পরব বহে মন্দ মন্দির রহত সবতনু কাঁপ
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ। জগজনে শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ।

শীতের এই পরিবেশে রাধা যখন অভিসারে চললেন শুভ্র দেহ মিশে গেল শুভ্র জ্যোৎস্নায়

ধবলিম এক বসনে তনু গোই
চললহি কুঞ্জে লখপ নাহি কোই।

অবশেষে কৃষ্ণকে যখন তিনি পেলেন মনে হল হিমশীতল জলে ডুব দিয়ে রত্ন লাভ করেছেন

মদন জলধি তলে তহি দেহ ঝাঁপ
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ।

পৌষরজনীর এই বর্ণনাটি সুন্দর। কিন্তু এদের কোনোটিই বর্ষাবন্দনা পদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার যেসব চিত্রকল্প প্রয়োগ করেছেন, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধর্মিতায় ও বর্ণোৎকর্ষে তারা এতই সমৃদ্ধ যে এদের বিশ্লেষণ করা সমালোচকের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। পূর্বে বলা হয়েছে, মেঘ শুধু কৃষ্ণের বর্ণতুল্য নয়, শুধু পিপাসিত পথিকের হৃদয়ে আশ্বাস দায়ক নয়, সে রাধার কাছে কঠিনতম বাধার প্রতীকও বটে। কিন্তু বাধা প্রবল বলেই বোধহয় তার আকর্ষণও তীব্র, তার বর্ণনায় কবিদেরও উৎসাহ অন্তহীন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায় শেখর থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণীর সব বৈষ্ণব কবিই, বর্ষার চিত্র এঁকেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদ 'রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া গরজন' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। এছাড়াও এমন বহু পদ আছে যা বারংবার উদ্ধৃতির যোগ্য। সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষার প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অপ্রতিরোধ্য, বিদ্যাপতির রাধা এই কথা বলে হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কোকিলকে তাড়িয়ে দিতে পারি, ভ্রমরদলকে করঙ্কণ ঝঙ্কারে নিবৃত্ত করতে পারি, কিন্তু ধবলগিরি থেকে মেঘ এলে তাকে ফিরিয়ে দেব কোন্ উপায়ে?'

৪

ওপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি প্রাকৃত-বিশ্ব-সম্পৃক্ত হওয়ায় বিশেষ একধরণের রসের আস্বাদন ঘটায়। কিন্তু সমগ্র পদাবলী জগতের পটভূমিকায় এদের সংখ্যা অল্প। বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পগুলি পাঠ করলে এই বিশ্বাস ক্রমে প্রগাঢ় হতে থাকে যে মানব সংসার নয়, নিসর্গ সংসারই কবিদের প্রকৃত প্রেরণাস্থল। নদীতরঙ্গ, বনপ্রকৃতি, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা, মেঘ বিদ্যুৎ বর্ষণ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এরাই প্রধান ভাবে পুষ্ট করছে বৈষ্ণবকবিদের ভাবজগৎ। পৃথিবীর কর্মমুখর পরিবেশ ও বাস্তবতার অতিস্পষ্ট আলোকে তাঁদের কল্পনা সঙ্কুচিত বোধ করে বলে তাঁরা নিসর্গের দিগন্তবিলীন প্রসার থেকে রাধাকৃষ্ণের লোকোত্তর প্রেমের উপযুক্ত চিত্রোদাহরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রাধার দেহের বর্ণনা প্রসঙ্গে জল কিংবা জলজবস্তুর উপমান কবিরা অনেককাল থেকে ব্যবহার করে আসছেন। বিদ্যাপতি লিখেছেন

কূপ গভীর তরঙ্গিণী তীর
জনমু সেমার লতা বিনু নীর।

নদীর অর্থাৎ ত্রিবলীর কূলে এক গভীর কূপ অর্থাৎ নাভি। সেখানে জল না থাকলেও রোমাবলীরূপ শৈবাল জন্মেছে। এরকম দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্ত্রীলোকের যৌবনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে জোয়ার জলের—তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে। নদীর মতো নারীর অপর উপমান হচ্ছে মেঘ। পদাবলীতে মেঘ নানার্থব্যঞ্জক। একটা অর্থ সে তৃষিত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধনকারী। নায়ক পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো নায়িকার প্রেম প্রার্থনা করলেন

জলধর জলঘন গেল অসোঁখ
করএ কৃপা বড় পরদুখ দেখি। — বিদ্যাপতি।

হে মেঘ, এখনো তুমি বর্ষণ করছ না, পরের দুঃখ দেখে মহৎ লোকেরা কিন্তু কৃপা করে। এই বর্ষণময়তা মেঘের একটি ধর্ম। আবার তার অন্য ধর্মও আছে, তা হলো অভিসারে বাধা সৃষ্টি করা।

কাজরে সাজলি রাতি বরিস পয়োধর ধার
ঘন ভএ বরিস এ জলধর পাঁতি দূর পথে গমন কঠিন অভিসার। — বিদ্যাপতি।

রজনী কাজলে সজ্জিত হলো, মেঘদল ঘন বর্ষণ করছে, দূরপথে অভিসারে যাওয়া এখন কষ্টকর।

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর এহনা তেজি অএলাহু নিঅ গেহ
রতনহু লাগি ন সঞ্চর চোর। অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ। — বিদ্যাপতি।

অন্ধকার রাত্রে আকাশে মেঘের গর্জন, এমনরাত যে রাতুর লোভে চোরও বার হয় না; অন্ধকারে নিজের দেহ নিজে দেখতে পাইনা, এ সময়ে নিজগৃহ ত্যাগ করে এলাম। এদুটি চিত্রে মেঘের মূর্তি অন্যরকম। তা পথিকের আনন্দকর নয়, বিঘ্নোৎপাদক। তা ছাড়া মেঘকে অন্যরূপেও ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন অশ্রু কিংবা দেহবর্ণ বোঝতে। কৃষ্ণ যখন রাধার জন্য ব্যাকুল, গোবিন্দ দাস লিখলেন জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথারি।

অশ্রুঝরা যে দৃষ্টি তারও উপমান মেঘ, যেমন

গুমগুম দেহ দুহু দিঠি মেহ
থেহ নাহি বান্ধই সঘনে বরখনিয়া। — বলরাম দাস।

কিন্তু মেঘের অপর যে ব্যঞ্জনা, এবং তা নিঃসংশয়ে সর্বোত্তম ব্যঞ্জনা, তা রাধার দেহজ্যোতির পটভূমি হিসেবে। বিদ্যাপতির একটি শ্রেষ্ঠ পদে এই ব্যঞ্জনার চরম নিদর্শন পাই

ধব গোধূলি সময় বেলি নব জলধরে বিজুরী রেহা
তব মন্দির বাহির ভেলি দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি।

এই পদটিতেই প্রথম রাধার রূপকে বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিত করে মেঘের পটভূমিতে প্রতিস্থাপনের দ্বারা উজ্জ্বলতর করবার সার্থক উদাহরণ দেখি। এর পর থেকে পদাবলীতে যেমন কৃষ্ণের নবজলধর কান্তির তেমনি রাধার বিদ্যুৎদীপ্ত রূপশিখার অজস্র উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত চণ্ডীদাসই অন্য আদি কবি যিনি এই বিদ্যুতের উপমাটিকে আরেকটি সার্থক রূপ দিয়ে বলেছেন 'থির বিজুরী বরণ গোরী পেখনু ঘাটের কূলে'। পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস একই উপমাকে আরো সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, যথা

ও নব জলধর অঙ্গ
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ

কিংবা

তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধর।

কিংবা

জলধরে বিজুরি উজোর।

বস্তুত পদাবলী সাহিত্যে মেঘ ও বিদ্যুতের মতো আলো ও অন্ধকারের ঘন ঘন প্রতিতুলনা লক্ষ্য করার মতো। আনন্দ ও বিষাদের ব্যতিক্রম ফোটাতে কবিরা বহুবার আলো ও অন্ধকারের ব্যঞ্জনা এনেছেন। সূর্য ও চন্দ্রের উপমানগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা বোঝা যাবে। রাধা যেখানে আনন্দিত মূর্তিতে প্রকাশমানা কবি তাঁকে চিত্রিত করেছেন 'অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু' (জ্ঞানদাস)। তাঁর কেশপাশে সিন্দূর বিন্দুটিকে মনে হয় 'সজল জলদে যেন উইল নবসূর' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। সূর অর্থে সূর্য। চন্দ্রের উপমাগুলিও এরকম। বংশীবদন যখন বলেন 'কপালে চন্দন চাঁদ করিয়াছে আলো' তখন বুঝি চন্দ্র এখানে রূপের স্নিগ্ধতা ও ঔজ্জ্বল্য ব্যঞ্জক। এখানে কবি পূর্ণ চাঁদের উপমা দিলেন। চাঁদকে আবার খণ্ডকলা-রূপেও দেখেছেন কবিরা, যেমন

কিবা সে দুণ্ডলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা। — লোচনদাস।

অনেকজন নারীর রূপ ফোটাতে চাঁদের বহুত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে

নব নব নাগরী বালা করু জলকেলি অলি সঙ্গে বালা
যৈছন চান্দকি মালা। — গোবিন্দ দাস। হেরলু পথে জনু চান্দকি মালা। — ঐ।

চন্দ্রের কেবল স্থিররূপ নয়, একটি চমৎকার চলরূপও আছে। শ্যামদাস শিশুকৃষ্ণের বর্ণনায় লিখছেন

হিয়াম পদক দোলে ঝলকএ কলেবরে

খেদব মোএে কোকিল অলিকুল বারব জখন জলদে ধবলা গিবি বরিসব
করকঙ্কণ ঝমকাঈ তখনুক কওন উপাঈ।

দুর্যোগময়ী রাত্রির তীব্র বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত যে প্রতিবেশ থেকে কবিশেখরের

সখিহে হামার দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে।

কবিতাটির জন্ম হয়েছে, গোবিন্দ দাসের অতুলনীয় চিত্রকলাটির উৎসও সেখানেই,

মন্দির বাহির কঠিন কপাট তহিঁ অত দূরতর বাদর দোল
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট। বারি কি বারই নীল নিচোল।

৫

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, এসকল চিত্রকল্পের শিল্পোৎকর্ষ কতখানি। এপর্যন্ত আলোচনাতে চিত্রকল্পসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ শুধু প্রদর্শিত হয়েছে। এদের স্থায়ীমূল্য কতটুকু তা বলা আবশ্যক।

একটি বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত পাঠক পদাবলীর চিত্রকল্পের সঙ্গে অনিবার্যত ইদানীন্তন কালের চিত্রকল্পের তুলনা করতে চাইবেন। এই তুলনা অসঙ্গত। ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যাদর্শের প্রতি তাতে অবিচার করা হবে। এককালের ভাবানুষঙ্গ অন্যকালে জোর হারাতে পারে, একযুগের পরিধিতে যে শিল্পরূপ স্বীকৃত হয় অন্যযুগে তা হয়তো অনাদৃত হবে। পদাবলীর চিত্রকল্পসমূহের ব্যঞ্জনাও তার স্বকীয় পরিবেশের বাইরে তেমন ক্রিয়াশীল হবেনা, এটা স্বাভাবিক। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গোবিন্দদাসের 'ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে' থেকে জীবনানন্দ দাশের 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়, কিংবা শ্যামদাসের 'চান্দ যেন ঢরঢর বহে যমুনায়' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়
চাঁদমালা তায় ভাসতে থাকে।— পর্যন্ত চিত্রকল্পের ইতিহাসে

কালগত ব্যবধান দুস্তর। আধুনিক জটিল জীবন যাত্রার প্রতীক যে চিত্রকল্প তার সঙ্গে ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিদের প্রযুক্ত চিত্রকল্পের তুলনা একান্ত অসমীচীন।

পদাবলী চিত্রগুলির তাৎপর্য অবশ্যই তাদের দেশকালগত ও ধর্মগত পটভূমিকায় গ্রহণীয়। তথাপি, যথাসম্ভব অনুকূলতার সঙ্গে এদের বিচার করবার পরেও সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন অত্যধিক পুনরাবৃত্তির ফলে এদের দীপ্তি নষ্ট হয়নি কিনা। চিত্রধর্মী পংক্তিতে যে দ্রুতগতি, যে গণিত ঔজ্জ্বল্য থাকে, কোনো কোনো পদে তার আকস্মিক স্ফুরণ অবশ্যই আমাদের স্তিমিত প্রায় অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে। 'মঝু হরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল চকিত চমকি চলি যাই'— গোবিন্দদাসের এই বাক্যটির শেষ চারটি শব্দে একটি তীক্ষ্ণতা আছে। উৎসাহী গবেষকের পক্ষে এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষা করলে পদাবলীর কটি চিত্রকল্পে এরকম তীক্ষ্ণ দ্যুতির সন্ধান পাওয়া যাবে তা নির্ভয়ে বলা কঠিন। হার্বার্ট রীড ফর্মের আলোচনা করে তার দুটি ভাগ দেখিয়েছেন —Organic ও abstract। প্রথম মৌলিক উদ্‌ভাবন প্রসূত organic form কালক্রমে abstract form-এর শৃঙ্খলিত নিয়মে বৈশিষ্ট্যহীন আত্মবিসর্জনে বাধ্য হয়। সমালোচকের ধারণা, পদাবলীর অধিকাংশ চিত্রকল্পই প্রাথমিক প্রেরণার গতিবেগ নিঃশেষিত হবার পর নির্বিশেষ পৌনঃপুনিকত্বে শোকাবহ পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

লুভর মিউজিয়ামে দর্শকদের জন্য চারটি প্রবেশ দ্বার আছে। পূর্ব প্রান্তের দরজা দিয়ে মিশরীয় বিভাগ থেকে যাত্রা শুরু করা চলে অথবা পশ্চিম প্রান্তে ইয়োরোপীয় মধ্য যুগের ভাস্কর্য্য সংগ্রহে আসা যায়। কিন্তু প্রাসাদের মাঝ বরাবর উত্তর ও দক্ষিণদিকের সরাসরি প্রবেশপথ দুটিরই প্রাধান্য বেশী। এই দুই দরজা দিয়ে প্রতাহ দর্শকরা আসেন দলে দলে। এর এক থেকে অপর প্রান্তে বিস্তৃত বিরাট ভেসটিবিউলএ টিকিটের কিওস্ক, হাতের ব্যাগ, পার্শেল, ছাতা ছেড়ে হাল্কা হবার ব্যবস্থা এবং বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শনের প্রতিলিপি, পোষ্ট-কার্ড, ফটোগ্রাফ, প্লাস্টার ও ব্রোঞ্জ কাস্ট কেনার কাউনটার, সব গ্যালারীর অবস্থান ও সংগ্রহের তালিকাজ্ঞাপক একটি মডেল ইত্যাদির সমাবেশ দর্শকদের মনকে যেন সংগ্রহশালার বিশিষ্ট আবেষ্টনীতে থাকার জন্যে তৈরী হতে বলে। লুভর দেখার আমন্ত্রণে এইখানে দাঁড়াতাম মার্থএর অপেক্ষায়। সে পৌঁছে ভাল দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েই "দাঁড়াও কয়েক মিনিট এখুনি একটু ঘুরে আসছি" বলে উধাও হয়ে বেশ লম্বা সময় আমাকে অপেক্ষার অসোয়াস্তিতে বিব্রত করে ফিরত, এবং বিশেষ কোন গ্যালারিতে যাবার প্রস্তাবে ও সেখানে গিয়ে ছবি দেখায় ও শিল্পালোচনায় খুব ব্যস্ত হয়ে যেত, যাতে এই সময় নষ্টের জন্য আমি কোন অভিযোগের সুযোগ না পেতে পারি। পরপর বার দুয়েক এই "এখুনি আসছি"র পুনরাবৃত্তি হতে রাগত হয়ে বল্লাম "ম্যাদময়সেল্ লুভর্এ পৌঁছেই তোমার নিত্য এক প্রয়োজনে অতি সম্প্রসারিত যে কয়েকমিনিট কাটিয়ে আসতে হচ্ছে সেটা কি এখানে আসার আগে সেরে এলে ভাল হয় না?" সে বল্ল "না মঁসিয় তুমি আমার প্রয়োজনকে আন্দাজ করেছ ভুল। লুভর্ এ এলেই সবার আগে একজনের সঙ্গে একটু মোলাকাৎ করবার একটা সর্ত্ত আমার সঙ্গে অনেক বছর ধরে ঠিক হয়ে আছে, সে অভ্যাসটা অকারণে আমি ছাড়তে চাই না। তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে মাপ চাচ্ছি।" কিন্তু আবার যখন একসঙ্গে লুভর্ দেখার ব্যবস্থা হ'ল সে ঠিক আগের মত "রাগ করো না আমি এখুনি আসছি বলে" উধাও হল। রাগ ও কৌতূহল এ দুয়ের নির্দ্দেশে তার গতি অনুসরণ করে পৌঁছালাম গ্রীক গ্যালারিতে। চলতে চলতে ভাবছিলাম মার্থএর সঙ্গীবিবাগী হওয়ার ঔৎকট্য বোধহয় একটা ভান। তার নিশ্চিয়ই আছে সবারই মত এক বিশেষ সঙ্গী যার সঙ্গে রাঁদেভুর ব্যবস্থা হয় এই লুভর্এর কোন গ্যালারি দেখার অছিলায়। এই গ্যালারিতে বহুবার তার সঙ্গে এসেছি এবং গ্রীকশিল্প নিয়ে আমাদের তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে প্রচুর। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে গ্রীক কৃষ্টির দেওয়া বুনিয়াদ পেয়ে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা ধরে নেন যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ইয়োরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত। মার্থ এই যুক্তিকে একরকম ঝগড়া করে জারি করবার চেষ্টা করত। আমি তাকে ধৈর্য্যের সঙ্গে বোঝাতে চাইতাম যে, যে গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারীর বড়াই আজকের ইয়োরোপবাসীরা করতে চান তার উৎপত্তি ও প্রসারকালিন গ্রীকরা কিন্তু ইতালির উপদ্বীপের ওপারের জগৎ সম্বন্ধে জানতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, কারণ ঐসব দেশের লোকেদের সভ্যতায় তখন বলবার বা জানবার মত কিছু ছিল না। সেযুগের গ্রীকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

উপনিবেশের এলাকায় পশুপালন ও চাষবাসে ব্যাপৃত গ্রাম্যজীবনে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর পূর্ব্ব আফ্রিকার শক্তি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করা ছিল তাদের একটা উচ্চাভিলাষের স্বপ্ন। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করত বহু ভাগ্যান্বেষী ভাড়া করা গ্রীক সৈনিকরা। ধনরত্ন ও সৌভাগ্যের চিন্তায় তাঁদের দৃষ্টি ধাবিত হোত এজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে। শুধু তাঁরা নন গ্রীকের দেবতারা ও পৌরাণিক বীরেরাও পাড়ি দিতেন প্রাচ্যের দিগন্তে। দ্রাক্ষারসের মদিরার তর্পণে পূজা পাবার উদ্দেশ্যে পানে মত্ত মেনাদ্, ফন্, সাতির্, সেণ্টর, ও নিমফদের বাহিনী নিয়ে দেবতা দিওনিসুস প্রাচ্যের বহু রাজ্য জয় করে পরিশেষে বিজিত ভারতের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। শোনা যায় যে বীর আলেকজাণ্ডার এর ভারত বিজয়াভিযানের পশ্চাতে ছিল সামর্থে দেবতা দিওনিসুসএর সমকক্ষ হবার স্বপ্ন। বহু অভিমান পীড়িত গ্রীকেরা আপন সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার শারীরিক চর্চ্চায় দৈহিক শক্তিকে যতখানি বর্দ্ধিত ও কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে তাতে চেষ্টিত থাকতেন এবং এইভাবে অর্জ্জিত অমানুষিক দৈহিক বলে বলীয়ান সংখ্যালঘিষ্ঠ বীরেরা যখন বৈরীর বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করতেন তাঁদের শৌর্য্যে ও জয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ জনসাধারণ দেখত তাঁদের স্বরূপে দেবতার আবির্ভাব। তাই কবি হোমারএর কাব্যে কত স্বর্গের দেবদেবীরা মর্ত্তের মানুষের রঙে ও খেলায় মিশে কত লীলাখেলা করে গেলেন। শক্তির উন্মেষে উদ্বেলিত পেশীর ছন্দে লীলায়িত সুন্দর মানবদেহে অবতীর্ণ হলেন জিয়ুস্, এ্যাপোলো, হেরা, আথেনা পোসেইদন, এ্যাফ্রোদাইতে ও অন্যান্য দেবদেবীরা পাথর ও ব্রোঞ্জের মনোরম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু গ্রীক ভাস্করের গড়া এই দেবমূর্ত্তিতে মানবাতীত বল ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠলেও তার মধ্যে বিকাশ পাইনি শক্তিমত্তার দম্ভ বা রূপাভিমান। মানবাকৃতিতে নিহিত কেবল এক স্বর্গীয় মহিমাভরা এই দেবতারা ভক্ত ও পূজারীদের অর্ঘ, আহুতি, পুষ্প, মাল্যে, পানে, আহারে, নৃত্যে, সংগীতে মোহিত হয়ে মর্ত্তকে যেন স্বর্গের ভ্রমে গ্রীসের পর্ব্বতশৃঙ্গে, প্রান্তরে নদীতটে, তোরণে, স্তম্ভে, মন্দিরে ও প্রাসাদে আসন পরিগ্রহ করেছিলেন স্থায়ীভাবে। সেকালের গ্রীসের সেরা ভাস্করশিল্পী ফোইদিয়াস, মাইরন পলিক্লিতাস ও প্রাক্সিতেলস্ এর রচিত অপরূপ সবমূর্ত্তিগুলিই বোধহয় কালের ধ্বংসাবলেপনে অজ্ঞাতের গহ্বরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে আজ কেবল প্রাচীন নকলনবিশী শিল্পীদের করা তাঁদের সৃষ্টির নাম ও স্মৃতি বহনকারী কয়েকটি মূর্ত্তির অনুকরণ মাত্র। এই নকলকরা মূর্ত্তির রূপ যদি আমাদের মন ও হৃদয়কে সৌন্দর্য্যের মাধুরী দিয়ে আজ এমন মধুময় করতে পারে, না জানি তাঁদের আসল রচনাগুলিকে দেখবার সুযোগ পেলে রূপভোগানন্দের কোন সাগরে আমরা অবগাহন করে মজে যেতাম। আজ ভেনাস্ দ্য মিলো কি ভিক্ট্রি অফ সামোথ্রাস্ একাধারে মানবদেহের অসীম সৌন্দর্য্য ও ভাস্কর্য্য নৈপুণ্যের উচ্চতম উদাহরণ হিসাবে জগতবিখ্যাত হলেও ঐ রচনার সমসাময়িক রূপবেত্তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট শিল্প রচনার উদাহরণ হিসাবে এই মূর্ত্তি দুটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আমার ভেঙ্গে হারিয়ে যাওয়া পোরসেলিনের শ্লেটটার মত কত মূর্ত্তির খণ্ডিত ভগ্নাংশ স্মৃতির ইশারাতে ভাঙ্গাকে পূর্ণ করে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় কত দেব ও দেবীর জীবন্ত স্বরূপকে। গ্রীকমূর্ত্তির বহু যুযুধান বীরের আহ্বান, নিমন্ত্রণের হাতছানি, এ্যাপোলোর নিপুণ আঙ্গুলের টানে লায়ারতন্ত্রীতে ধ্বনিত সুরমূর্চ্ছনার মোহ ও এ্যাফ্রোদাইতের উন্মুক্ত রূপের আকর্ষণকে এড়িয়ে আমার চোখ পড়ল মার্থএর উপর। বিরাট জানলা থেকে একফালি

রোদ পড়েছিল দুকোণ হয়ে ভাঁজ খাওয়া দেওয়ালের এক কিনারায়। আমার দৃষ্টির আড়ালে পড়া সেই দেওয়ালে রাখা একটা কিছু যেন সম্মোহিত করে মার্থকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তার স্থির দৃষ্টির কিনারা উপছে অশ্রুধারা দুগণ্ডে প্রবাহিত দেখলাম। আমার অস্তিত্বকে সে দেখলই না। তার লক্ষ্যকে অনুসরণ করে দেখলাম সামনে রয়েছে পার্থেনন্-এর মন্দিরে খোদা ঘোড়সোয়ারী বীরদের একটির শুধু প্রায় ভাঙ্গা মুখ যার উপর রোদ্দুরের আভা পড়ে জীবনের স্ফুরণ যেন ঝলকে ঝলকে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। মূর্ত্তিটির সঙ্গে মার্থএর অশ্রুধারার সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেই আস্তে আস্তে ফিরে গেলাম ভেস্‌টিবিউলএ। সে কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসতে সেদিনের রফামত ড্যাচগ্যালারি দেখে দিনটা কাটান গেল। লুভর্‌এ আমার আর এক নিমন্ত্রণে মার্থ ফের "আসছি বলে" চল্ল গ্রীক গ্যালারিতে এবং তাকে অনুসরণ করে দেখলাম সে আবার দাঁড়িয়েছে যৌবনের বাজনায় স্ফুট সেই মুখখানির সামনে। কিন্তু সেদিন অশ্রুধারার বদলে দেখি যে তার চোখদুটিতে হাসির উচ্ছ্বাস আর যেন বাধ মান্‌ছে না আর কোন প্রচ্ছন্ন কথোপকথনে তার ঠোঁট দুটি ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল। আমার মনে হল সে নিশ্চয়ই পাগল। এই হেঁয়ালিভরা আচরণ কাউকে ছলনার অভিনয় তো হতে পারে না। তাকে চমকিয়ে ডাক দিলাম। কোন বিস্মৃতির ওপার থেকে ধাক্কায় সে বাস্তব জগতে আছড়ে পড়ে বলে উঠল "একি তুমি এখানে কেন! ভেস্‌টিবিউলে আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।" বল্লাম মাদময়াসেল্ অপেক্ষা করতে বলেছ ঠিকই কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করতে তো মানা করো নি। তোমার কোন আপত্তি বা অনুযোগ আজ শুনব না। আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব তোমাকে ঠিকমত দিতেই হবে। এর জন্য যদি আমাদের বন্ধুত্বকে বরাবরের মত ছুটি দিয়ে দিতে হয় তাতেও আমি রাজী আছি। তুমি এই প্রায় ভাঙ্গা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন কাঁদলে এবং হাসলে কেন? এ কোন রহস্য যে তুমি যেন নীরবে কথা বলছিলে কোন অশরীরীর সঙ্গে। "সে বল্ল" কে'দেছি, হেসেছি বাগবিতণ্ডা করেছি কার সঙ্গে তুমি তো চিনলে না। ও আমার গ্যাব্রিয়েল্। আজ আর গ্যালারী দেখা হবে না। সোনএর ধারে গিয়ে বসি চল তারপর এ হেঁয়ালির ভাল করে সমাধান করে দেব।"

অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ স্লেন গাছের পাতা ও শাখা প্রশাখার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে নীচের জমি আর নদীর জলে সোনালী আলোর বুটি ফেলে কত নক্সা কাটছিল। এই মেশান আলো ও ছায়ার চাঁদোয়ার নীচে পাতা বেঞ্চে আমরা বসে গেলাম। মার্থ বল্ল "গাব্রিয়েল আমায় ছেড়ে গিয়েছিল দশবছর আগে এবং এ পর্যন্ত তার কথা আর কাউকে বলিনি।" সে যে কথা প্রসঙ্গে এই নাম দুএকবার আগে উল্লেখ করেছিল তা স্মরণ করিয়ে তার কথায় বাধা দিলাম না। সে বলে চল্ল "গাব্রিয়েল এর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গ্রাঁ সার্লোতে এক নাচের সম্মেলনে। আমার পরিচিত এক সখের শিল্পী এই নাচের আসরে যাবার জন্যে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পরিচিত ছেলেবন্ধু সঙ্গে কেউ না থাকায় ঠিক পচ্ছন্দসই নাচবার সঙ্গি পাচ্ছিলাম না। দুএকজন বৃদ্ধ নৃত্যের নামে আমাকে ধরে জাপটাজাপটিতে প্রায় ভল্লুক নৃত্য করলেন। বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে নাচের আসর ছেড়ে চলে আসবার উদ্যোগ করছি এমন সময় "আমি গাব্রিয়েল্ মাদ্‌ময়াসেল তুমি আমার নাচবার সম্মতি দিলে ধন্য হব।" বলে সামনে দাঁড়াল ব্রড ও সুপুরুষ একটি যুবক। তার সঙ্গে নাচতে নাচতে ভাল্‌স্‌এর ঘূর্ণিপাকে যে প্রণয় শুরু হয়ে গেল তারি আনন্দস্রোতে আমরা নিজেদের অবাধে ভাসিয়ে দিলাম। সে কিন্তু সাধারণ প্রেমাধের মত কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত ছিল না। তার মতে স্ত্রী

ও পুরুষের প্রথম ভালবাসার বন্ধনে পরস্পরকে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী দান করার যে নিয়ত নিবেদন চলতে থাকে তার জোয়ারে ভাটা না পড়তে দেওয়ার ম্যাজিকটি আবিষ্কার করা প্রেমের সবচেয়ে বড় কথা। প্রণয়ের প্রথম জোয়ারে অনেক ব্যক্তিগত মুখ রুচিভেদ ও ভিন্ন স্বভাবের স্তর ডুবে যায় সাময়িকভাবে প্রেমের গভীরে। সময়ে ভালবাসার উৎসের খরস্রোত থেমে স্থির হলে সেই রুচির ভেদ আর চাপাপড়া স্বভাবের স্তর প্রেমের বন্যার উপরে ভেসে উলট-পালট খেতে থাকে। কারো ভাগ্য এই ভেসে উঠা স্তরগুলি যেন বড় বড় আইসবার্গ বয়ে প্রেমের জাহাজে ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে ডুবিয়ে দেয়। তাই সে আমাদের প্রণয়ের গভীরে মনের চেতনও অবচেতনের তলায় কোন বিবাদী অংশ লুকিয়ে আছে কিনা তার আবিষ্কারের চেষ্টা করত। যদি বলতাম এখন সে সবের খোঁজ ছেড়ে দাও। যবে সে অংশের উন্মেষ দেখা দেবে তার নিষ্পত্তি তখন করা যাবে। সে আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যদি বলতাম,"কি দেখছ" সে জবাব দিত "মনে করো না তোমার মুখের রূপসুধা পান করছি কারণ তুমিও জান আর আমি জানি যে তোমাকে কেউ সুন্দরী বলবে না। কিন্তু তোমার মুখ চট্‌কদার সুন্দর নয় বলেই এত ভালবাসি কারণ কোন রূপলোভীর চোখ তোমার সৌন্দর্য্যসুধা অবাধে পান করতে লুব্ধ হবে না বলে। বিধি যদি তোমার মুখের সুচারু ছাঁদ দেবার সময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকেন, গলা থেকে পা পর্যন্ত যে সুঠাম মূর্ত্তি তিনি গড়েছেন তাতে তাঁর গভীর মনোনিবেশের কোন ত্রুটি পাওয়া যায়না। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ যে এই সৌন্দর্য্য অর্ঘ পাবে কেবল আমার কাছ থেকে। সে আমাকে লজ্জায় রাঙা করে আরো যে কত অন্তরঙ্গ কথা বলতো তা তোমায় আমি বলতে অপারগ। গাব্রিয়েলএর মতে, প্রাক্-সিতেলস্ সৃষ্ট বলে অভিহিত এ্যাফ্রোদাইতের যে টর্‌সো লুভর্‌এ আছে আমার দেহ নাকি তারই অনুরূপ। সে ছিল এক অদ্ভুত প্রতিভাবান শিল্পী। মূর্ত্তিগড়া আর চিত্রণে তার ছিল সমান দক্ষতা। নিজের দেহকে নিয়মিত ব্যায়ামে সুন্দর সক্রিয় রাখায় তার উদ্যম ছিল প্রচুর। সুপুরুষ সেতো জানলেও তার এ নিয়ে কোন আত্মাভিমান ছিল না। তিন বছরের সান্নিধ্যে আমাদের ভালবাসার প্রথমে দুএকটা আকস্মিক ফাটল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বন্ধ হয়ে ক্রমে একটা নিরেট ও পরিপূর্ণ প্রেমকে আমরা পেয়েছিলাম যার স্বরূপের সবটা সারা অনুভূতি ও আনন্দ দিয়ে নিয়তই ধরা ছোঁয়া যেত। এর পর ঠিক হ'ল আমরা বিবাহ করে ঘর বেঁধে হব স্বামী স্ত্রী।

মূর্ত্তিগড়া ও ছবিআঁকা ছাড়া গাব্রিয়েল্‌এর আর এক নেশা ছিল মাঝে মাঝে কোন বিপদসঙ্কুল অভিযানের মাঝে ফেলে দিয়ে তার জয়ের ও উত্তেজনার আনন্দকে উপভোগ করা। পরকে তার বাহাদুরী দেখাবার উদ্দেশ্যে নয় এ কেবল নিছক নিজে একটা উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চলত তার এই দুঃসাহসের সম্মুখীন হওয়া। এই সময় শোনা গেল যে এক অধ্যাপক উত্তরমেরুর গবেষণায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এক জাহাজে শিগ্গির পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা একজন শিল্পীকে তাঁদের সঙ্গে যেতে আহ্বান জানান যে তাঁদের আবিষ্কারকে চিত্রণে নিপুণভাবে আলেখ্যবদ্ধ করতে পারবে। এ অভিযানে বিপদ ছিল তাই আর কেউ এগিয়ে আসার আগে গাব্রিয়েল্ এ যাত্রায় সাথী হবার ব্যবস্থা করা ফেল্ল। আমার শত অনুযোগ ও আপত্তি তাকে ঠেকাতে পারল না। সে বলে গেল "মার্থ আমার একক জীবনের এই শেষ অভিযান। ফিরে এসে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে সঁপে দেব। জানি এই সাময়িক বিচ্ছেদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার মনে অশেষ কষ্ট দিচ্ছি। এতে আমার হৃদয়ে ও মনে ব্যথা জমছে প্রচুর তাই অনুযোগে আমার সংকল্পে দুর্ব্বলতা এনে ফিরাতে চেষ্টা ক'রো

না। অনুপস্থিত ভালবাসার দিনগুলি যে একেবারে ফাঁকা থেকে যাবে এ ভেবে না, আমার অশরীরী সত্ত্বা তোমাকে ঘিরে থাকবে সর্ব্বদা। সেই সত্ত্বাকে এখনকার মত তোমার জিম্মায় দিয়ে গেলাম, দেখো যেন তোমার সান্নিধ্য থেকে তাকে হারিয়ে' ফেল না"।

সে চলে যাবার পর আমার সামনে থেকে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবসান হয়ে গেল যেন বরাবরের মত, রাত্রি ও দিনের কোন ব্যবধান রইল না। ঘড়ির কাঁটা হয়ে গেল নিশ্চল। তারপর চলে গেল নীরব কয়েক সপ্তাহ।

হঠাৎ একদিন সকালে দেখা সংবাদপত্রের বড় অক্ষরের হেড্‌লাইন আমার চোখে পড়ে ছুরিকাঘাত করল। মুহূর্ত্তে হৃদয়কে মুচড়ে দারুণ নিষ্পেষণে কে যেন আমার নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ করে দিল। গাব্রিয়েল্‌দের জাহাজ বরফের সমদ্রে ডুবে নিঃখোজ হয়ে গেছে। ষাটজন যে যাত্রী ছিল তাদের একজনেরও কোন হদিস্‌ পাওয়া যায়নি।

আমার মন ও হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। দু'একদিন পরে যখন এই দারুণ দুর্ঘটনাকে কিছুটা ধারণা করার মত বুদ্ধি ফিরে এল, ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব। স্যেননদীর বিভিন্ন পুলের উপর বসে কতদিন অপেক্ষা করলাম নির্জ্জন ক্ষণের জন্য যখনি নিজেকে নামিয়ে দিতে পারব নীরবে সকলের অগোচরে জলের গভীরে এবং একইভাবে জলে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে মিলে যাবে গাব্রিয়েল্‌এর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু যতবার চেষ্টা করলাম মনে হল যেন সব পথচারীরা আমার সংকল্প বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্র করে মুহূর্ত্তের জন্য একলা হ'তে দিল না। কিছুদিন পর বুঝবার ও ভাববার শক্তি আর একটু পরিষ্কার হলে জ্ঞান হ'লো যে আমার মত দক্ষা সাঁতারুর পক্ষে সকলের অলক্ষে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ মিললেও একেবারে ডুবে মরা সম্ভব হবে কিনা বেশ সন্দেহ আছে। বিয়োগের শোকে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত' অগ্নিশিখাগুলিকে একে একে নির্ব্বাপিত করে সময়। রয়ে যায় অঙ্গারে আবৃত ক্ষতের খানিকটা যার বেদনার ধার থেকে তীক্ষ্নতা চলে গিয়েছে।

ভাবলাম কনভেন্টএ নান্‌ হয়ে ছারখার হয়ে যাওয়া জীবনটাকে ভগবানের পায়ে অর্পণ করে দেব। গীর্জ্জায় মনোবেদনা নিবেদন করে শান্তি পাবার আশায় যে পুরোহিতের শরণ নিলাম তিনি আমার মনোকষ্টের বেদনার লাঘবে স্বান্তনা না দিয়ে কন্‌ফেশন্‌এ বার বার জানতে চাইলেন আমাদের বাস্তব প্রণয় জীবনে কতবার দৈহিক মিলন ঘটেছিল তার সঠিক সংখ্যাকে। বুঝলাম নিজেকে এমন করে ঠকিয়ে হারাবার চেষ্টা না করে গাব্রিয়েল্‌এর স্মৃতির ছড়ান টুকরোগুলি কুড়িয়ে একত্রিত করে যদি তার স্বরূপে খানিকটা ফিরে পেতে পারি তা দিয়ে হয়ত বাকি জীবনটাকে কোনমতে বরদাস্ত করতে পারব। সে ছবি আঁকত মূর্ত্তি গড়ত তাই তার কাজের আনন্দের আস্বাদ পেতে গিয়েছি আতলিয়েতে। সজীব মনের মানুষ কাছে থাকলে তার স্থূল উপস্থিতি, দৃষ্টি আর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দেখতে দেয়না তার বাহ্য রূপকে। গ্যাব্রিয়েলকে কাছে পেয়ে তার অঙ্গের প্রতিটি কণাকে অনুভব করেছি কিন্তু সে চেহারার সম্পূর্ণ আদলকে চোখ দেখতে যেন ভুলে গিয়েছিল। তার কন্ঠস্বরে আনন্দের রোমাঞ্চে উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং তারই আবেগ শুনতে দেয়নি তার বক্তব্যের সবটুকু। বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে অশরীরী গাব্রিয়েল্‌ এর চেহারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবার আগ্রহে আমার চোখ দুটি ডুবুরীর মত অতীতস্মৃতির ঘোলাজল কত হাতড়াতে লাগল। আধশোনা তার কত কথা মনের আঙ্গিনায় সম্পূর্ণ হয়ে আসবার জন্যে ভিড় করতে লাগল। তারই দু একটা যেন তার কন্ঠস্বরকে জীবিত করে বেজে উঠত আমার কানে মাঝে মাঝে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার সত্ত্বা চিরতরে আমার

সান্নিধ্যের বন্ধন ছেড়ে চলে যাইনি। একদিন মনে পড়ল গাব্রিয়েল্‌ বলেছিল তার এক সংস্করণ নাকি লুভর এ আছে। তখুনি ছুটলাম সেখানে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দেখতে লাগলাম শত শত দর্শকদের আসা যাওয়া কিন্তু তার মধ্যে হারান গাব্রিয়েল্‌কে ফিরে পাওয়া গেলনা। ভাবলাম যে একবার দুবারের জন্যে যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের মধ্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব বরং যাঁরা নিত্য এখানে আসেন বহুকাল ধরে, তাঁদের মধ্যে সন্ধান করা উচিত। লুভ্‌র এর প্রত্যেক কর্মচারীদের এক এক করে দেখে নিলাম এমনকি ঝাড়ুদারকে পর্য্যন্ত। কিন্তু তবু তার সন্ধান মিল্‌ল না। তখন তন্ন তন্ন করে দেখলাম লুভর্‌ এর সব ছবিগুলি যদি তার একটির মধ্যে রয়ে গিয়ে থাকে তার চেহারার একটা ছাপ। অকৃতকার্য্য হয়ে মন নৈরাশ্যে ভরে গেল। করলাম শেষ চেষ্টা ভাস্কর্য্যের সব মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যদি সে কোথাও লুকিয়ে থাকে। সব আশা ছেড়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে একদিন যাচ্ছিলাম গ্রীক গ্যালারী দিয়ে। জানলা দিয়ে এক কোনে বেশ রোদ পড়েছিল। শীতে জমা হাত দুটোকে তাপে একটু সেঁকে নেবার উদ্দেশ্যে সেখানে পোঁছতেই দেখি গাব্রিয়েল্‌ এর মুখখানি আমার দিকে সারা নয়ন মেলে চেয়ে আছে। শুনলাম যেন সে বলছে "কি মার্থ কেমন আছ?" কেবল মুখখানি দেখা গেল ও আস্তে আস্তে আস্তে সে তার সবখানি নিয়ে এল আমার সামনে। যবে থেকে তাকে ফিরে পেয়েছি আমাদের কত অসমাপ্ত কথাকে বলে পুরো করে নিয়েছি। কিন্তু সে যেন একটু বদলে গিয়েছে। কোনদিন সে নিজে হেসে আমাকে হাসিয়ে আনন্দের হুল্লোড় তোলে আবার কোনদিন অভিমান করে নীরব থেকে পাষাণ হয়ে আমাকে কাঁদিয়ে আকুল করে। তাই তুমি আমাকে কখনও কাঁদতে বা হাঁসতে দেখেছ।"

দেখতে দেখতে কখন শুখনো কখন ভেজা অটাম্‌এর দিনগুলি ছোট হতে হতে শীতের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিল। সব পাতা ঝরে বুলভার ও নদীর পাশের গাছগুলি কঙ্কালসার হয়ে ঠান্ডা যেন ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করল। বৃষ্টির বদলে ঝরতে থাকে শাদা পালকের মত তুষারের কণারাশি এবং ক্ষণকালের মধ্যে সারা দৃশ্যকে শবাচ্ছাদনের সাদা কাপড়ে ঢেকে মৃতের মত করে দেয় চারিদিক নিস্তব্ধ ও নীরব। বেশ কয়েক সপ্তাহ কাজের চাপে মার্থ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। একদিন শীতে জড়ান আল্‌সেমিতে লেপ ছেড়ে উঠব কিনা তার বাজী কস্‌ছি এমন সময় দরজায় পড়ল কার করাঘাত। দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি মার্থ দাঁড়িয়ে। সে আগে কখনও হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ভাবলাম কোন নতুন বিপদ বা হেঁয়ালির তাড়নায় সে এসেছে এত ভোরে আলোচনা করতে। সে শুধু বল্লে, "এসেছি বিদায় নিতে। যদি চাও তো এইখানে সেটা সেরে ফেলে চলে যাব আর যদি ষ্টেসন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও তো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।" আমাকে সে কোন প্রশ্ন করতে দিল না। পথে শুনলাম গাব্রিয়েল্‌ এর সঙ্গে তার নাকি কয়েকদিন ধরে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তাই তাকে অনুপস্থিতির সাজা দিতে সে চলেছে হল্যান্ড-এ। সে জানাল যে কয়েক মাস তাকে না দেখতে পেলে গাব্রিয়েল্‌-এর অহঙ্কারটা বেশ কিছু কমে যাবে।" এর পর আমি আর কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করিনি। মনে মনে বিচার করার চেষ্টা করছিলাম আমাদের মধ্যে কে পাগল।

গাড়ী ছাড়বার ঘন্টা বাজতে সে কামরায় উঠে বল্লে "তোমায় আমি কোন ঠিকানা দেব না, কারণ অনুপস্থিতিতে বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চিঠিলেখার ভানে আমি বিশ্বাস করিনা। প্রথম মাসে হয়ত ঘন ঘন চিঠি পত্রের আদান প্রদান হবে তারপর চিঠি দিতে ভুলে গিয়ে কর্তব্যের

পর্য্যায়ে পড়ে যাবে এ অভ্যাস, শেষে সে কর্তব্য ভুলতে ভুলতে একদিন চিঠি লেখায় অবহেলা, অনিচ্ছুক অপরাধ হয়ে দাড়াবে এবং এই অপরাধকে চাপা দেবার সমর্থনে পত্রের স্রোত একেবারে শুকিয়ে যাবে। কি হবে বন্ধু এসব বৃথা ছলনায়। আমাদের মনের খাতায় জমা থাক তোমার আর আমার স্বল্প দিনের সান্নিধ্য। গাব্রিয়েল্-এর মত তো আমার কোন দ্বিতীয় সংস্করণ নেই আর থাকলেও বা তা হয়ত তোমার কাছে আমার আদলের প্রাণহীন এক ছবি বা মূর্ত্তি ছাড়া আর বেশী কিছু হবে না। গাব্রিয়েলকে দেখো মাঝে মাঝে যদি সময় পাও এবং যদি মনে করো যে আমার বিচ্ছেদের ব্যথায় সে পীড়িত তা হলে তাকে জানিয়ে দিও যে সে ব্যথার বেশীটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

ট্রেন ছেড়ে দিল। রুমাল উড়িয়ে বা হাত দুলিয়ে বিদায়কে দীর্ঘ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সর্পিল গতিতে ট্রেন প্লাটফরম্ অতিক্রান্ত হয়ে সকালের ঝাপসা আলোয় খানিকক্ষণ চোখের সামনে রেখে দিল তার পশ্চাতের গাঢ় ধোঁয়া রঙের স্বল্প পরিসরটুকু। সেটুকুও ক্রমে মিলিয়ে রয়ে গেল কেবল একটা ছোট্ট লাল আলোর বিন্দু এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাকে একটা কুয়াসার পর্দ্দা মুছে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

জীবনরসিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রায় সমসাময়িক হলেও মানসধর্মের দিক দিয়ে উভয় শিল্পীর ব্যবধান প্রচুর। একজনের মানস প্রবৃত্তি প্রধানতঃ রোমান্সধর্মী, আর একজনের বাস্তবধর্মী। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে একজনের মানস সান্নিধ্য প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকার কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, এবং গ্রীক নাট্যকার ও ইংরাজ নাট্যকার সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে; আর একজনের মানসিক নৈকট্যবোধ বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে, আর সমসাময়িক তরঙ্গিত সামাজিক জীবন ও বিক্ষুব্ধ গণজীবনের সঙ্গে। একজন সে যুগের বিদগ্ধ নাগরিকের প্রিয় নাট্যকার, আর একজন সর্বযুগের নির্যাতীত জীবনের সহানুভূতিশীল বাণীকার। মধুসূদনের নাট্যশিল্পের আবেদন তাই এযুগের নাট্যমোদীর অন্তরকে আন্দোলিত না করলেও দীনবন্ধুর কোন কোন নাটকের (যেমন নীলদর্পণ) আবেদন এখনও অনুভূতিশীল বাঙালীর অন্তরে সক্রিয়।

মধুসূদনের নাটক রচনার একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিল, আর প্রথম নাটক রচনা করেই দীনবন্ধু রাতারাতি খ্যাতিমান। মধুসূদনের নাটকে ক্রমবিকাশের ধাপ আছে, আর দীনবন্ধুর প্রথম নাটকই তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মধুসূদনের নাটক প্রধানতঃ কল্পনানির্ভর, আর দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটক বাস্তব নির্ভর। নাটক রচনার অনুপ্রেরণার জন্যে মধুসূদন রঙ্গমঞ্চের আনুকূল্য প্রত্যাশী, আর দীনবন্ধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরোক্ষ স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত (গিরিশচন্দ্র ঘোষের "শাস্তি কি শাস্তি" নাটকের উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য)।

দীনবন্ধুর নাট্যসাফল্যের মূলে হলো জীবন সম্পর্কে বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা আর সংবেদনশীল অন্তরের ব্যাপক সহানুভূতি। দীনবন্ধুর কল্পনায় মধুসূদনের সুদূরবিস্তার ছিল না। কিন্তু ছিল সার্থক নাট্যকারের দৃষ্টির objectivity (যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা আত্মগত কল্পনায় সুন্দর, তাহাতে তাঁহার তেমন দখল ছিলনা; কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে যে রস ও সে সৌন্দর্য, দীনবন্ধু সে রসের রসিক, সে সৌন্দর্যের কবি"।— দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার নির্ণয়ে চিন্তাশীল সমালোচক ডাঃ সুশীলকুমার দের উক্ত মন্তব্য অভ্রান্ত।

দীনবন্ধু জীবনরস রসিক। একমাত্র "কমলে কামিনী"তে যখনই তিনি রোমান্টিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তখনি তাঁর শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। জীবনরসসৃষ্টিতে কোথাও তিনি মাত্রাতিরিক্ত করুণ, কোথাও হাস্যরসাশ্রয়ী। তাঁর হাস্যরসে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে, কিন্তু জ্বালা নেই। হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি তাঁর গুরু ঈশ্বরগুপ্তের স্থূল হাস্যরসের দ্বারা প্রভাবান্বিত; কিন্তু হাস্যরসের সে স্থূলতা সে যুগের রসরসিকতার পরিচয়বাহী। দীনবন্ধুর হাস্যরস স্থূলতাধর্মী হলেও ভাঁড়ামিমুক্ত!

বহু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক নীলদর্পণের (প্রকাশকাল ১৮৬০) জন্যে চিরকাল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ স্মরণীয় কীর্তির মর্মমূলে আছে সার্বজনীন ও সার্বকালিক মানবিক আবেদন। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার মানবসভ্যতার আদি হতে যুগে যুগে চলে আসছে; সে নির্যাতনের পরিসমাপ্তি কোনদিন হবে কিনা, হলেও কবে হবে, কেউ বলতে পারে না। যুগে যুগে এ নির্যাতন বিভিন্নরূপে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—

কখনও রাজনৈতিক, কখনও সামাজিক, কখনও অর্থনৈতিক। নির্যাতনের রূপ যাই হোক, সবলের এ অত্যাচার মানবতাবিরোধী। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে মানবতার শত্রু এ সমস্ত অত্যাচারীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী শিল্পীর লেখনী উদ্যত হয়েছে, তাদের বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের উত্তাপ দেশের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করেছে, আর তাদের উদ্যম করে তুলেছে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর অত্যাচার দূরীভূত করতে। মানবদরদী শিল্পী মিসেস্ ষ্টো-র Uncle Tom's Cabin এভাবে একদিন আমেরিকার অত্যাচারী ধনী সম্প্রদায়ের মানব-নির্যাতনে বাধা দিয়েছিল, আর জীবনশিল্পী ডিকেন্সের Nikolas Nickelby এবং Oliver Twist বিলেতের শিশুনিপীড়নের বিপক্ষে একটা প্রবল গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। জীবনশিল্পী হিসেবে দীনবন্ধু মিসেস ষ্টো বা ডিফেন্সের সমগোত্রীয়—শিল্পরচনার উৎকর্ষে না হোক, নির্যাতীত মানবতার প্রতি সহানুভূতির গভীরতায়। নাট্যশিল্প বিচারে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' good art এর পর্যায়ে না পড়লেও যে মহৎ উদ্দেশ্যে সে নাটকখানি রচিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বিচারে নাটকখানিকে great art বা মহৎ শিল্প বলতে বাধা নেই। প্রবীণ সাহিত্যিক ডাঃ সুকুমার সেন সংগতভাবেই মন্তব্য করেছেন;— দেশ বিদেশের অল্প সংখ্যক যথার্থ পুণ্যবান সাহিত্য স্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধু অন্যতম।" (দ্রষ্টব্য ঃ— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৮)।

পরাধীন দেশের সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের কারণ বিদেশী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত করবার জন্য জাতীয় প্রেরণা তখনও দেশের ভেতর সচেতনভাবে জাগ্রত হয়নি। তাই "নীল দর্পণে" দীনবন্ধুর ভূমিকা জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিকের নয়,—মানবতাবাদী হৃদয়বান শিল্পীর। অসহায় বাংলা ও বিহারের গ্রামবাসীর ওপর সেকালের রাজানুগৃহীত নীলকর সাহেবেরা অত্যাচারের যে স্টীম-রোলার চালিয়েছিল তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল সহৃদয় দীনবন্ধুর, আর সে অভি-জ্ঞতা তাঁকে প্রবর্তনা দিয়েছিল নিষ্কম্প হস্তে সে প্রজাপীড়নের নিখুঁত চিত্র অংকিত করতে। অত্যাচারী নীলকরদের হাতে অসহায় পল্লীবাসীর সে লাঞ্ছনার চিত্র যে অতিরঞ্জিত নয় তার পরিচয় পাওয়া যায় Black Acts (বেথুন সাহেবের খসড়া, ১৮৪৯) এর সমর্থনে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বিবৃতি পড়ে;—

"I have constantly heard of complaints of the facible seizure of crops, of unauthorised ploughing of lands escorted by lathials. I have heard of ryots with their unoffending families being summoned and imprisoned at the pleasure of the planter. I have heard also of beating and maltreatment even, unto death, yea of house erased, village burned and lives taken in cold blood with bullet and shot. In innumerable instances it would pay the poor cultivator far better to sow many other crops than the indigo plant, but he is bound hand and foot till he receives a money advance and signs a contract to cultivate the planters' favourite crop."

And I am equally satisfied that investigation will prove that to a large extent the immunity arises from Europeans not being amenable in serious offences to the jurisdiction of the moffusil courts."

নীলদর্পণ নাটকের পরিণতি ট্র্যাজিক হলেও নাট্যধর্ম বিচারে নাটকটিকে ট্র্যাজেডি বলা চলে না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে একের পর এক মৃত্যু, আত্মহত্যা, ভোগলোলুপ পুরুষের অত্যাচার প্রভৃতি বীভৎস চিত্র নাটকের ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আধুনিক নাটকের পরিণতি সৃষ্টি প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক W. H. Hudson -এর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ

"In modern plays, as in modern novels, we have often indeed "a conclusion in which nothing is concluded," in which we are left, as Tenngson once com-plained, poised on the crest of a wave which does not break." (দ্রষ্টব্য Study of Literature—Pp. 281-82).

এ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাসৃষ্টির নৈপুণ্য দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভায় ছিল না। "নীলদর্পণে" শুধু ঝড়ের সংকেত সেই, প্রবল ঝড়ের আঘাতে বনস্পতির মৃত্যু ঘোষণাই যেন এখানে নাট্যকাব্যের প্রধান লক্ষ্য। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির চাইতে করুণ রসের উদ্বোধনেই নাটকার প্রথমাবধিই সচেতন।

'নীলদর্পণ' নাটকে সূক্ষ্ম ভাবসংঘাত সৃষ্টি প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করেছে নাট্যকারের চিত্র-ধর্মিতা— তাই কোন কোন সমালোচক নীলদর্পণকে পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে 'নাট্যচিত্র' আর দীন-বন্ধুকে নাট্যকার না বলে "ককেলই চিত্রকর—photographer" বলে অভিহিত করেছেন। আবার কোন কোন সমালোচক 'নীলদর্পণের' সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির একটা নিকট সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

নাটকীয় চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে নাট্যকারের সংলাপ রচনার শক্তির স্পর্শে। কালিদাস বা সেকস্‌পীয়র এখনও নাট্যামোদী পাঠক সমাজে আহূত; এ জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁদের নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা, বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে নাটকীয় চরিত্রগুলোর মুখে যদি সে ভাষা দেওয়া যায় তা হলে সে চরিত্রসৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, চরিত্রবিকাশেও আসে সাবলীলতা,, আর পাঠক বা দর্শকের মনেও নাট্যরস সহজেই জমে উঠে। নীলদর্পণ নাটকে দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু—ভদ্রেতর শ্রেণীর সংলাপ তাদের প্রাণের ভাষায় যোজনা করেছেন, তাই সে চরিত্রগুলো অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নাট্যরসসৃষ্টির সহায়তা করেছে। আর ভদ্রশ্রেণীর সংলাপ রচনায় যখনই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সে যুগের সাহিত্যে প্রচলিত উচ্চকোটির সাধুভাষার তখনি সে চরিত্র হয়ে ওঠেছে আড়ষ্ট প্রাণহীন। এ মন্তব্য শুধু তাঁর 'নীলদর্পণে'র ভদ্র চরিত্রের সঙ্গে প্রযোজ্য নয়, লীলাবতী ও নবীনতপস্বিনীর সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি যশোর নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীর অমার্জিত মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে এত জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি করতে পারেন, ভদ্রশ্রেণীর সংলাপ রচনায় তিনি এত হাসাকর সাধুভাষা প্রয়োগ করতে গেলেন কেন সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। এখানেও তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যরচনার প্রভাবটাই বিশেষ করে স্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য ছিল যেমন হাল্‌কা চালের তেমনি তাঁর গদ্য ছিল গুরুভার, আড়ষ্ট ও গতিহীন। ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রের মুখে সে ভাষা ব্যবহার করায় সে চরিত্রগুলোও যে আড়ষ্ট হয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি? উক্ত নাটক তিনটির বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে সমালোচক যখন মন্তব্য করেন— "Their plots are muddled, their characters are unreal and their dialogue is lifeless and unnatural". (দ্রষ্টব্য Bengali Literature—J. C. Ghosh)

তখন এ মত আংশিক সত্য বলেই মনে হয়। দীনবন্ধুর ভদ্রশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে সত্য হলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর চরিত্রকে অবাস্তব, কিংবা তাদের সংলাপকে প্রাণহীন বা অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাকে বাস্তবজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বলেই মনে হয়।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক দিয়ে বিচার করলে দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে সে যুগের পক্ষে অগ্রগামী সাহিত্য সৃষ্টি বলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা। যে যুগের যুগন্ধর সাহিত্যি-কেরা (যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম) পুরাণ ইতিহাসের সুদূর কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আত্মনিমগ্ন, সে ভাবসর্বস্বতার যুগে দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু বাংলা দেশের কৃষক সমাজের বেদনার শোনিতরাগরঞ্জিত কাহিনীকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে জীবন্ত রূপ দেবার

চেষ্টায় ব্যাপৃত। দীনবন্ধুর শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্তু এ দরদী স্রষ্টাকে শুধুমাত্র নাট্যকার আখ্যা না দিয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের নবজাগ্রত জীবনবোধের চারণ কবি বললেই বোধ হয় সমীচীন হয়। গত শতাব্দীর বাস্তবধর্মী রচনার ক্ষেত্রে নীলদর্পণ পতাকা-স্থানীয়। সে যুগের নিছক কল্পনাপ্রধান রচনাদর্শের সামনে নীলদর্পণ স্থাপন করেছিল বাস্তব-মুখী নাটকের এক মহৎ আদর্শ। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে শ্রেয়বোধের আদর্শ শুধু সে যুগের কেন, এ যুগের নাট্যপ্রচেষ্টায়ও খুব কমই অনুসৃত হয়েছে।

দুই

পূর্বেই বলা হয়েছে দীনবন্ধুর প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র ছিল হাস্যরস-সৃষ্টিতে। এ হাস্যরস সহানুভূতিশীল জীবনদ্রষ্টার। হাস্যরসিকের বস্তুদৃষ্টি জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে করেছিল উদার, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। এ দৃষ্টি প্রভাবেই দীনবন্ধু জীবনের সকল প্রকার অসংগতি ও অসামঞ্জস্যকে হাস্যালোকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছেন। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে দীনবন্ধুর সহমর্মিতা ছিল অপরিসীম; তাই নিজে পুণ্যাত্মা হয়েও উচ্ছৃঙ্খল ও পাপপ্রবৃত্তির চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি সে চরিত্রগুলোকে জীবনধর্মী করে তুলেছেন। যেখানেই তিনি একটু গুরুগম্ভীর হবার চেষ্টা করেছেন বা রোমান্টিক কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করেছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ; আর যেখানে তিনি সমসাময়িক জীবনের সর্বপ্রকার অসংগতি ও অসামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করে চরিত্রসৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন সেখানে তাঁর নাট্যপ্রতিভা দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'নীলদর্পণ' নাটকে একের পর এক করুণ ও বীভৎস ঘটনা যখন পাঠকের রসপ্রবৃত্তিকে পীড়িত করে, তখন নিরক্ষর চাষীদের কৌতুককর কথাবার্তা সে করুণরসের পীড়ন হতে পাঠককে মুক্তি দেয়। কিন্তু নীলদর্পণ নাটকের ভাবগম্ভীর্য হাস্যরসের অনুকূল নয় বলে এ নাটকে হাস্যরসের আলোকে চরিত্রসৃষ্টি প্রচেষ্টা তেমন স্ফূর্তি পায়নি, যেমন পেয়েছে দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক প্রহসনগুলোতে। নীলদর্পণের পরবর্তী 'নবীন-তপস্বিনী' নাটকে (১৮৬৩) মূল রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী হতে বেশী উপভোগ্য হয়েছে জলধর জগদম্বা ও মালতী-মল্লিকার হাস্যাত্মক ও কৌতুককর উপাখ্যান। লীলাবতী নাটকের (১৮৬৭) হেমচাঁদ নদের চাঁদের হাসি-ঠাট্টা বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছে। "কমলে কামিনী" নাটকটি নেহাৎ বস্ত সম্পর্কহীন হয়ে পড়তো যদি না তার মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা থাকতো।

তিন

দীনবন্ধু যুগসচেতন নাট্যকার। তাঁর যুগসচেতনতা একদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে মানবতার লাঞ্ছনার চিত্র 'নীলদর্পণে', আর একদিকে সামাজিক অসংগতির পরিচায়ক প্রহসনগুলোতে। সে যুগটাই ছিল গদ্য, পদ্য ও নাটকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও নক্সাজাতীয় রচনার যুগ। সে যুগ-প্রভাবকে অতিক্রম করা দীনবন্ধুর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রহসনত্রয়ী (জামাইবারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী) এ যুগচেতনারই প্রত্যক্ষ ফল। এ প্রহসনগুলোর মাধ্যমে দীনবন্ধু তাঁর সমসাময়িক সমাজজীবনের সকল প্রকার অসংগতিকে ব্যঙ্গ করেছেন সকৌতুকে। ব্যঙ্গ-প্রবণ হলেও দীনবন্ধু কিন্তু সত্যিকারের satirist নন, তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যেও মানবজীবনের

স্খলন, পতন, ও অসংগতির জন্যে বেদনা আছে সেজন্য দীনবন্ধুকে বলা চলে হাস্যরসিক জীবন-শিল্পী humourist। তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে সমসাময়িক জীবন নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ। এখানেই হাস্যরসশিল্পী হিসেবে গুরুশিষ্যের মৌলিক পার্থক্য। দীনবন্ধুর হাস্যরস করুণরসের স্পর্শে উজ্জ্বল।

'জামাইবারিক' প্রহসন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্বে'র বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। রামনারায়ণের নাটকে কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফলে কুলীন কন্যাদের দুরবস্থার বেদনাময় কাহিনী, আর দীনবন্ধুর প্রহসনে কুলীন কন্যাদের হতে কুলীনপুরুষদের অবস্থা বিপর্যয়ের কাহিনী। পরিকল্পনার অভিনবত্ব পরম উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিনবত্বটাই বড় কথা নয়, লঘু কৌতুক সৃষ্টির সঙ্গে শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিত ঘরজামাইদের জীবনের যে কারুণ্যের দিকটা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মর্মস্পর্শী। এখানে নাট্যকার নিছক কৌতুক সৃষ্টির পর্যায় অতিক্রম করে জীবনশিল্পীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ। অবিমিশ্র প্রহসন "বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে হাসারসসৃষ্টি প্রচেষ্টা মুখ্য হলেও নারীমাংস লোলুপ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের আশ্রিত জীবন-পরিণতিকে নাট্যকার করুণ-মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে প্রাচীন পন্থী গ্রাম্য বাঙালী জীবনের প্রতি হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা; আবার 'সধবার একাদশী'তে সে যুগের উচ্ছৃঙ্খল, আত্মভ্রষ্ট, পরানুকরণকারী ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী তরুণের জীবনের ট্র্যাজেডিকে নিয়ে নাট্যরস সৃষ্টি চেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই দরদী শিল্পী দীনবন্ধু সে যুগের বাঙালী জীবনের মর্মে পৌঁছাবার প্রয়াস পেয়েছেন। হাস্যরসের মাধ্যমে সে যুগের নব্যশিক্ষিত সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে মধুসূদনের সমগোত্রীয়। বিশেষ করে যে ফটোগ্রাফারসুলভ নিপুণতার সঙ্গে দীনবন্ধু সে যুগের নব্যতন্ত্রী যুবক সমাজের বিনষ্টির চিত্র অংকিত করেছেন তাতে তাঁর প্রেরণার উৎস কোথায় তা খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যুগধর্ম ও যুগশিক্ষার প্রভাবে সে যুগের বাঙালী-জীবনে যে প্রবল ভাঙ্গন এসেছিল স্বজাতিপ্রেমিক দীনবন্ধু হাস্যরসের আলোকে তার উপভোগ্য বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন সধবার একাদশী নাটকে। অধ্যাপক সুশীল কুমার দে দীনবন্ধুর স্বজাত্যবোধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন; —"দীনবন্ধুর স্বজাতিবাৎসল্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতই আন্তরিক ছিল। বাঙালীর বাঙালীত্বকে তিনি সকলের ওপরেই স্থান দিতেন। তাই পরিবর্তনযুগের শিক্ষিত বাঙালীর এই জাতিধর্মচ্যুত অনুকরণের মোহ তাঁহার মনকে ব্যথিত ও প্রতিভাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।" (দ্রষ্টব্য ঃ—দীনবন্ধু মিত্র— পৃঃ ৮৯)।

সধবার একাদশী নাটকে লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ একথা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এ নাটকে তিনি তাঁর সৎ-উদ্দেশ্যকে শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন কিনা? এ প্রসঙ্গে একাধিক সমালোচক দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে রুচিহীনতার অভিযোগ আনায়ন করেছেন এবং এ মন্তব্য করেছেন, প্রকাশভঙ্গী যেখানে রুচিহীন সেখানে রসসৃষ্টির প্রশ্ন অবান্তর। এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টিতে যে রুচির পরিচয় আছে তাকে এ যুগের মানদণ্ডে বিচার করলে দীনবন্ধুর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বাঙালী তখনও মার্জিতরুচির নামে রুচিবাগীশ হয়ে ওঠেনি। অসংগত বা হাস্যকর বস্তু দেখলে বাঙালী তখন প্রাণখুলে হাসতে জানত। সে হাসি আধুনিক দৃষ্টিতে স্থূলরুচির হতে পারে; কিন্তু সে হাসির ভেতর সে যুগের বাঙালীর অন্তর্লোক যেন অনাবৃত হয়ে আছে। দীনবন্ধুর প্রহসনের ভাষাও সে হাসির আলোকে উজ্জ্বল। বাঙালীর সে প্রাণের ভাষার স্পর্শেই

'সধবার একাদশী'র সৃষ্ট চরিত্রগুলো, বিশেষ করে নিমচাঁদ দত্তের চরিত্র এত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সে যুগের নীতিবাদী সাহিত্যিক রামগতি ন্যায়রত্ন দীনবন্ধুর নিমচাঁদ দত্তের চরিত্রে প্রবল দুর্নীতির আভাস দেখে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যে আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে জীবনশিল্পী দীনবন্ধু এ মদ্যপের চরিত্র এঁকেছিলেন সে সহমর্মিতার অভাবের জন্যই এ দুর্নীতির অভিযোগ আনা সম্ভব হয়েছে। নিমচাঁদ দত্ত নব্যবঙ্গের প্রতীক। উদার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসেও সে যুগের নব্যতন্ত্রী বাঙালী ব্যক্তিগত জীবনে প্রগতিশীলতার নামে যে উচ্ছৃংখলতা ও অসংযমকে প্রশ্রয় দিতো সে আত্মভ্রষ্টতা দীনবন্ধুর স্বাজাত্যপ্রীতিকে পীড়িত করেছিল। সে হৃদয়ের বেদনাকে তিনি করুণ মাধুর্য দান করেছেন তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি নিমচাঁদ দত্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীচিত্তের এ একাত্মতা মানবত্মার অবতরণকে ট্র্যাজেডির করুণ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। সম্ভাবনাপূর্ণ একটা তরুণ জীবনের পতনের চিত্র অনুভূতিশীল পাঠক মানের অন্তরকেই স্পর্শ করে। এখানেই নাট্যকারের রসসৃষ্টি প্রচেষ্টা সার্থক—সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর!

দীনবন্ধুর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সন্ধিযুগের নাট্যকার। সে কারণে তাঁর নাটক সে যুগের দোষগুণ-মিশ্রিত। দীনবন্ধুর নাট্যশিল্পের বিচার করতে হবে তাই সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। না হলে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা নির্ণয়ে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজ! আই, এস, সি! ডাক্তার কমল। একটি টুকটুকে বউ। তার পাটের অপিসের সায়েবের মতই কমলের মেজাজটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে মনের ওপর। ওই বয়স ঝক্‌ঝকে প্যান্ট, কোট, কমল অপিসে ঢুকল। দাঁড়িয়ে উঠল সবাই। কিন্তু ডাক্তার হলে আবার অপিস কি করে হয়? নিজের কাছেই ধরা পড়ে নিজের মনের অসংবদ্ধ কল্পনা। তা হোক। অপিসে কি সায়েব ডাক্তার থাকে না? ক্লার্ক সায়েবের সঙ্গে কি কমল ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে না? খুউব। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গড়গড় করে ইংরেজী বলছে কমল। জলের মত। সায়েব থ' মেরে গেছে।। বলছে, তোমায় বিলেত পাঠাব। তারপর বিলেত! ভারতে আপত্তি কি? বিলেতে কমল যাবেই। ক্লার্ক সায়েব ওকে সেধে পাঠাবে, ও কি না গিয়ে—পারে!' বিলেতে যাবার দিন প্রণাম করতে এলো কমল ওকে। ও জড়িয়ে ধরল কমলকে। এঁকি জড়িয়ে কি ধরল! দিবাস্বপ্ন ভাঙল। তাকিয়ে দেখে মৃগনয়নী ওর পাশে কখন এসে পা ছড়িয়ে বসেছে আর ও জড়িয়ে ধরেছে মৃগনয়নীর একখানা মাংসল পা।

—ও মা! এঁকি!

মৃগনয়নী সরে বসে। বনবিহারী লজ্জিত হয়। পাশ ফিরে শোয়। মৃগনয়নী কি একটা সেলাই করছিল। বোধহয় অমলের পকেটটা। ছিঁড়ে খুলে গেছে। বনবিহারী ওপাশ ফিরেই বলে,—শুনেছ?

—কি?—মৃগনয়নী সেলাই করতে করতেই বলে।

—কমলের পড়ার খরচা কিছুই দিতে হবে না!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও নাকি মাসে মাসে দশটাকা করে পাবে।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—ওই টাকাটা ওর নামে পোস্ট অপিসের ব্যাঙ্কে রাখলে কেমন হয়?

মৃগনয়নী একটু বিরক্ত হয়। এ ধরণের আলাপ ভাল লাগে না ওর। কাঁঠাল গাছে, এখন থেকে গোঁপে তেল!

—প্রথম মাসে না হয় তোমায় একখানা সাড়ী কিনে দিক।

মৃগনয়নীর হাসি পায়, বিরক্তিও লাগে। চুপ করে থাকে। আপনা-আপনি চুপ করে বনবিহারী। আবার স্বপ্নের আমেজ এসেছে। এবারে স্বপ্নটা বিলেত থেকে কমলের ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়ায় নেমে এসেছে। সে চলবে না। তিনি যে মেয়ে গছিয়ে আমার ছেলেকে পর করে নেবেন। সেটি চলবে না। আমার ছেলেকে বিয়ে দোব। নগদ পাঁচ হাজারের এক পয়সা কম নাব না। জোর করে যদি মেয়ে দিতে আসে। আসবেই। মারতে আসবে। মারতে অমনি এলেই হোল? ব্যাটাছেলেকে থুড়ে দোব না? খবরদার এক পা—। মৃগনয়নী ঠেলা মারে বনবিহারীকে,—কি হোল তোমার? স্বপ্নে মারামারি করতে গিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল বনবিহারী। চমকে উঠে পড়ে।

—অমন গোঁ গোঁ আওয়াজ কচ্ছিলে কেন?

আবার লজ্জিত হয় বনবিহারী,—কই? ও বোধহয় সর্দি আটকে গিয়েছিল।

—তবু ভাল!

মৃগনয়নী নিজের কাজে মন দেয়। আবার বনবিহারীর ঘুম-ঘুম আসে। এবারে আর স্বপ্ন নয়। ঘুম।

ঘুমের পর ঘুম। রাতের পর রাত কেটে যায়। মাস কয়েক বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে বনবিহারী। দোকান থেকে ফিরে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে। একটি লম্বা ঘুমে রাত কাবার। মাঝে একটু শান্তিভঙ্গ হয়েছিল অমলকে নিয়ে। অঙ্কে ফেল করেছিল আধ বছরি পরীক্ষায় আর একদিন মায়ের আঁচল থেকে আটআনা পয়সা চুরী করে ফিরেছিল রাত নটায়। মারধর একটু করতে হোল। তারপর কমলের ওপরই ভার দিতে হোল। তুই ওর অঙ্কটা একটু দেখিস বাবা! কমল তারপর থেকে ওকে নিয়ে বসে অঙ্ক করাতে। পড়ায় ও মাঝে মাঝে। আর ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। একদিন ঘুম আরও আরামের হয়েছিল, যেদিন দোকানের মালিক ব্যাটাছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কমল। মালিক মশাই ফতুয়ার বোতামটা ভাল করে লাগিয়ে শুদ্ধ বাংলায় বললে,—বড়ই প্রীত হলাম। আনন্দিত হলাম। এত উত্তম ভাবে পাশ করা, একি ইয়ে মানে যাই হোক, এর পর কি করা হবে?

—পড়ব।—বললে কমল।

—কি পড়া হবে?

—আই, এস, সি!

—উত্তম! উত্তম! আরও বেশী প্রীতি হলাম।

এর পরই আসল কথাটা পাড়লেন।— আমার সন্তান। ওই একটি মাত্র পুত্র। বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মবুদ্ধিধারী কিন্তু একটু ইয়ে—। তা' বাপু, তুমি যদি তাকে একটু দেখাশুনো করতে পার! কমল চুপ করে থাকে। বলেন আবার,— বুঝেছি। কি বলতে চাইছ! তা সাধ্যমত দশ পাঁচ টাকা দোব। বনবিহারী পুলকিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। কমল গম্ভীর মুখে মালিকের দিকে তাকিয়ে বললে,— আমার একটু অসুবিধে আছে?

—কি অসুবিধে?

একটু চুপ করে থাকে কমল। বনবিহারীর বুক কাঁপে, কি না জানি বলবে কমল।

—কলেজ খুললে একটু বেশী পড়তে হবে।

—তাত হবেই। ওরি ভেতর একটু ইয়ে করে—।

—আজ্ঞে পড়াটা একটু শক্ত।

বনবিহারী এতক্ষণে কথা বলে।—খুব কঠিন। ষাট সত্তর খানা বইই পড়তে হবে।

—তা উত্তম। কিন্তু একটু সময় করতেও পারবে না?

—মাপ করবেন

কি সুন্দর পরিষ্কার জবাব দিতে পারে কমল। বেটাছেলের মুখটা চুন হয়ে গেল। একটু ভয় হোল বনবিহারীর। এর পর থেকে হয়ত পান থেকে চুণ খসলেই তাকে গালাগাল করবে ব্যাটাচ্ছেলে। তা করুক। তবু কমল যে মুখের ওপর এমন স্পষ্ট জবাব দিতে পারে দেখে অবাক হয়েছে বনবিহারী। খুসীতে মন ভরে উঠেছে। এই একদিন গভীর আরামে ঘুমোতে পেরেছিল বনবিহারী। মৃগনয়নীকে বললে,— শালার মুখটা চুণ হয়ে গেল! মৃগনয়নীর হাসি পায়,—তুমি দেখছি তোমার মনিবকে খুব সম্মান করো?

—সম্মান ওই বেটাচ্ছেলেকে সম্মান।

তিনমাস পর মাইনে বাড়াবে বলে আজ আব্দি বাড়াল না!

—আর বাড়াবেও না।—মৃগনয়নীর খুব হাসি পায়।— তোমার ছেলে আরও ভণ্ডুল করে দিয়ে এসেছে।

—তা করুক। তবু কমলের বুকের পাটা দেখে চোখ জুড়োল! কোত্থেকে ও যে অত সাহস পেলো।

মৃগনয়নী এবারেও হাসে। কেন পাবে না। ওর মামার বাড়ীর রক্ত কি ওর গায়ে নেই! দুর্দান্ত জমিদারের রাজসিক রক্তের উদ্দামতা কি কিছু পাবে না? পাবে। কিন্তু সেইজন্যেই মৃগনয়নীর সবচেয়ে ভয়। উদ্দামতার ফল সংসারে কখনও ভাল হয় না। কর্তাবাবুর বিশাল মুখখানা আর চোখের সেই জান্তব সাহসের অসমতার কথা আজও ভুলতে পারেনি মৃগনয়নী। কর্তাবাবু কখনও বুক নীচু করে চলতে জানতেন না। বুক উচু করেই চলেছেন নিজের গর্জনে নিজে মত্ত হয়ে। সে মত্ততার ফলও ভাল হয়নি। ভাল হয় না। একটা নিশ্বাস ফেলে চলে যায় মৃগনয়নী। বনবিহারী মৃগনয়নীর মনের কথা বোঝে না। অবাক হয়ে চুপ করে থাকে সায় না পেয়ে।

এমনি করেই ত' কাটছিল। কিন্তু ইদানীং কলেজ থেকে ফিরতে কমলের অনেত রাত হয়। এত রাত অব্দি আবার কলেজ কি? প্রথম কেউ কিছু বলত না। ভাবত হয়ত পড়তে যায় কোথাও। মৃগনয়নী বলত,—জানো, বড় রাত করে ফেরে কমল। বনবিহারী বলত হেসে।—তা ফিরুক, ওসব খুব কঠিন পড়া। কোথাও হয়ত পড়তে যায়। উত্তরে মন উঠত না মৃগনয়নীর। কমলের একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন ওর নজরে পড়ে। মৃগনয়নীর নজরে—মায়ের সন্তানের যে একটু পরিবর্তনই প্রথম ধরা পড়ে। মৃগনয়নী বেশ বুঝতে পারে, কিছু একটা হয়েছে ওর। ওর টিকালো নাকের দুপাশে ডাগর চোখদুটো আরও গভীর হয়ে উঠেছে। অনেক সময় এত গভীর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে ও যেন ভুলে যায়, ও কোথায় আছে। মৃগনয়নী দুতিনবার তাকে ডাকে,—খোকা, অ খোকা! হয়ত তৃতীয় ডাকে সাড়া দেয়।— কি বলছ?

—কি ভাবিস অত?

উত্তর পাওয়া যায় না কমলের কাছ থেকে। অসহ্য নীরবতা।

মৃগনয়নীর বুকটা কাঁপে।—কি ভাবিস দিনরাত?

কমল মায়ের দিকে তাকায়। একটু হাসে।

—বড় খিদে পেয়েছে মা! মুড়ি-টুড়ি যা হোক কিছু দাও না?

মৃগনয়নী একটু আশ্বস্ত হয়। জলখাবার এনে দেয়। তবু শান্তি নেই। সন্তানের চিন্তায় শান্তি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে মৃগনয়নীর।

নাড়ী ছেঁড়া কিনা! নিজের রক্তের জিনিষ! বলত মৃগনয়নী। ওর ওপর টানটা ছিঁড়ে আসা বড় কঠিন বাবা! আজ আর কোন ক্ষোভ নেই, কিন্তু তখন-তখন বুকের ভেতরটা কি যে করত, কি বলব! কথাটা সত্যি! মৃগনয়নীর হাসি হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। নিজেকে এমন চিরে চিরে দেখবার সাহস, কঠোর সত্যকে জীবনের প্রতিটি নিষ্ঠুর মুহূর্তের বিচারে চিনে এ কি সহজ? হাসত মৃগনয়নী,—এই ত' সবচেয়ে সহজ বাবা! আমরা ত' সহজ হতেই ভুলে যাই। তাই ভুল করি। সহজ হতে পারলে সংসারে ভুল হয় না। তবু সহজ হওয়া সহজ নয়। যতই বলুক মৃগনয়নী।

কমলের পরিবর্তনটা মৃগনয়নীকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। সেদিন ফিরতে কমল অনেক রাত করেছে। প্রায় সাড়ে বারোটা। বনবিহারী একটু চিন্তিত হয়েছিল। ফেরবার পর আশ্বস্ত হয়ে বললে,— আই, এস, সি-টা বোধহয় বড্ড কঠিন। শুয়ে পড়ল বনবিহারী। মৃগনয়নী কমলকে ভাত

দিতে গেল অত রাত্রে। মুখখানা ওর নীল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। যেন শুকিয়ে যাচ্ছে ছেলে। কি হোল ওর।

—কি হয়েছে বলত? আমার কাছে লুকোসনি খোকা!

কমল নীরব। মৃগনয়নীর গলাটা কাঁপে।— আমাকে লুকোবি এমন কি আছে? কমল নীরবে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে মাত্র। তবু চিন্তা গাম্ভীর্যের কুয়াশা ওর মুখ থেকে যায় না। থমথমে মুখখানা ওর। বৃথা ওকে বলা। একটা কথাও বলবে না। অগত্যা চিন্তার পাষাণ বুকে নিয়ে মৃগনয়নীই চুপ করে যায়।

সেদিন চাল আনতে মৃগনয়নী কমলকে একখানা দশটাকার নোট দেয়। ওইটেই মাসের এ কদিনের সম্বল। চাল, তেল, নুন, ডাল, সবই কিছু কিছু আনতে হবে। কমল নীরবে দশ-টাকার নোটখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বেরোবার আগে মৃগনয়নী চেঁচিয়ে বলে,— উনুনে কিন্তু আগুন দেয়া হয়েছে। দেরী করিসনি যেন! কমল বেরিয়ে যায়।

অমল ইস্কুলে যাবে। রৌদ্রটা তখন বারান্দায় আধাআধি। মানে দশটা বাজে।

—একটু তেল দাও মা। চান করব।

মৃগনয়নী বলে,—কমল দোকান থেকে না এলে কি করে দিই। সেই ত' কখন গেছে। এক-বার দেখত, বাবা দোকানের দিকে এগিয়ে। উনুন জ্বলে থাক্ হয়ে গেল। অমল গামছাটা প্যান্টের ওপর জড়িয়েই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। খানিকক্ষণ পর অমল ফিরে আসে।— দাদা ফেরেনি?

—না ত!

অমল মাথা চুলকে বলে,— দাদাকে ত' কোন দোকানে পেলুম না মা। অনেক খুঁজলুম। মৃগনয়নী ঘর থেকে গায়ে জড়াবার একটা চাদর নিয়ে আসে।

—চল আমিও বেরোই। গেল কোথায়

মৃগনয়নী অমলকে নিয়ে বেরোয়। পাড়ার দোকান কাছাকাছি সব দোকানে ঘোরে। কোথাও নেই। কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে মৃগনয়নীর। রোদের তাপে তালু দিয়ে আগুন বেরোয় ফিরে আসে হতাশ হয়ে।

—খিদে পেয়েছে মা।—বলে অমল।

দুটো পয়সা দেয় মৃগনয়নী।— মুড়ি এনে খা।

বাড়ী এসে মৃগনয়নীর রাঙা মুখখানা ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। ওকি তবে গুন্ডার হাতে পড়ল, না কোন খারাপ লোকের— মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। এগা-রোটা বাজল। বারোটা। একটা বাজতে আর দেরী নেই। কমল ফিরে এলো। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। চুলগুলো রুক্ষ অগোছালো। মৃগনয়নী তাকায় শুধু একবার। ওর চোখ-দুটোও রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন করে।— কি হোল? চাল কই?

কমল কথা বলে না।

—টাকা কই?

—নেই।— মাত্র একটা কথা বলে কমল।

মৃগনয়নী ফিসফিস করে তর্জন করে ওঠে,—হয় বল কি হয়েছে তোর। নয়ত আমায় মেরে ফেল। টস্ টস্ করে জল পড়ে মৃগনয়নীর রাঙা চোখ বেয়ে কমল তাকায়। ওর চোয়ালদুটো কঠিন হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কথা বলে।

—সে কথা শুনলে তোমার রক্ত জল হয়ে যাবে মা।

কি এমন কথা? মৃগনয়নীর মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে, বলে,—বুকের রক্ত আমার পাথর। জল হবে না। বল তুই! আর উত্তর নেই। আর একটা শব্দ বেরোয় না কমলের মুখে। কমল ওপরে চলে যায়। মৃগনয়নী আর খায় না। পেছন পেছন ওপরে ওঠে। পেট থেকে কি একটা বার করে কমল ওর বইয়ের তলায় রাখে। কাগজ দিয়ে ঢেকে। তারপর আবার বেরিয়ে আসে। বারান্দায় বসে থাকে। মৃগনয়নী ঘরে ঢোকে। বইয়ের তলা থেকে জিনিষটি বার করে। কাগজে মোড়া। কাগজ জল হচ্ছে। এর পর—কি হয়েছে মৃগনয়নী আর জানে না। শুধু জানে ওর গা ঘেঁষে উঠেছিল, খোলে। ভেতর থেকে বেরোয় ছোট একটি পিস্তল। পিস্তল! মৃগনয়নীর বুকের রক্ত এবার সত্যিই হাত পাঁওবশ হয়ে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান হয়, মৃগনয়নী দেখে কমল ওর চোখে মুখে জল দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে অমল। কমলের চোয়াল দুটো কি কঠিন। যেন স্কু আঁটা ইস্পাত। মৃগনয়নীর চোখ দুটো বেয়ে জল পড়ে। কমল এত কঠোর। নিজের সন্তান এত নিষ্ঠুর হতে পারে।

—আমাকে বল। সব খুলে বল!

মৃগনয়নী উঠে বসে। কমল মায়ের দিকে তাকায়। অমলকে বলে,—এ ঘর থেকে যা! অমল বেরিয়ে যায়। কমল এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে।— কি আর বলব মা। যেখানে আছি, সেখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।

—তবে আমাকেও সেখানে নিয়ে চল!

—পাগল নাকি?

—কি হয় সেখানে?

—দেশের কাজ। দেশ স্বাধীন করতে প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা।

মৃগনয়নীর গাল বেয়ে জল পড়ে।

—তুই এমন হলি খোকা?

কমল হাসে,— খারাপ ত' হইনি মা। দেশের কাজ খারাপ নয়।

আর কথা বলে না মৃগনয়নী। কথা বলা আর বৃথা। কাঁদাও বৃথা। অনেক্ষণ মুখ নীচু করে থেকে কি যেন ভাবে মৃগনয়নী। হয়ত বা নিজেকে শক্ত করে। তারপর মুখ তোলে। নীচে চলে যায়। কমলও বসে থাকে ওপরে। সবাই নীরব। বোবা সরাইখানা যেন। খানিক্ষণ পরেই বনবিহারী আসে। নীচে মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। শুধু চোখের জল পড়ে।

—কি ব্যাপার কি?— বনবিহারী বসে পড়ে ওখানে।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। আস্তে আস্তে সব কথাই জানাতে হয় বন-বিহারীকে। সব কথা। কিছুই গোপন করে না। বলতে না পারলে আর বাঁচবে না মৃগনয়নী। বুকে যেন পাষাণ চেপে আছে। এতক্ষণে যেন একটু হালকা বোধ করে ও। শুনে বনবিহারীর মুখখানা সাদা হয়ে যায়। কমল এমন হোল! সত্যকে কি করে আজ গ্রহণ করবে বনবিহারী। কত আশা! কত স্বপ্ন! ডাক্তার হবে কমল! সায়েব হবে। টুক্‌টুকে বউ! আরও কত অসার স্বপ্ন! সবই কি আজ একমুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল। বোবা হয়ে গেছে বনবিহারী। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মৃগনয়নীর দিকে। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকে একভাবে। ওর বুকের পাঁজরগুলো হাঁপরের মত ওঠানামা করছে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর বোবার মত সকাল সন্ধ্যা খেটেছে জোয়ালে বাঁধা বলদের মত। কত অপমান কত অসহ্য অভাব সয়েছে নীরবে। মুখ নীচু করে। কিসের আশায়? বনবিহারী নিজের সমস্ত জীবনটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে চায় যেন। পিছনে ফেলে আসা অনেক বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে দিন। এগুলো সবই কি এমন করে বৃথা হয়ে গেল! ওরা বসে থাকে, কিন্তু সময় বসে থাকে না। বেলা বেড়ে যায়। বনবিহারী একটা বড়

নিশ্বাস ফেলে। আবার দোকানে যেতে হবে। আবার সেই ফতুয়াপরা মালিকের অকারণ চিৎকার আর খোঁটাগুলো নীরবে সইতে হবে। মাস গেলে টাকা ঘরে আনতে হবে। উঠে পড়ে বনবিহারী। চামড়ার তালিদেওয়া জুতোটা পায়ে গলায়। পা যেন আর উঠতে চায় না। তবু যেতে হবে। আবার সেই একই রাস্তায় যেতে হবে হেঁটে। ট্রামের পয়সাও নেই একটা। কোঁচার খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়। না খেয়ে চলে গেল। দেখল মৃগনয়নী। তবু কিছু বলতে পারল না। এরপর কি আর খাবার কথা কিছু বলা যায়! আবার কলে জল আসবে। বাসন মাজতে হবে। উনুনে আগুণ দিতে হবে। ঠাকুরের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। কালও এ সব কাজেরই মানে ছিল। আজ আর কোন মানে নেই। শুধু করতে হবে। এই মাত্র।।

পাঁচিল

শরীরটা একেবারেই ভেঙে পড়ল বনবিহারীর। মৃগনয়নী যেন জানত যে বনবিহারী সইতে পারবে না। কিন্তু এমন করে যে ভেঙে পড়বে ধারণা করতে পারেনি। পাঁজরগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাংস যেটুকু দেহে ছিল, সেটুকুর চিহ্ন আর রইল না। মৃগনয়নী দেখল। বলল না কিছু। বলবার আর কিই বা আছে! অসুখটা পেটের। যা খায়, কিছুই হজম কয় না। যেমন খায়, তেমনি পড়ে।

—দুপো চললে মাথা টলে।— বলে বনবিহারী ক্ষীণ কণ্ঠে।

তবু দোকানে বেরোতে হবে। জামা পরে দরজার বাইরে আসতে হয়।

মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে শুধু।

একবার বলে,—আজ না হয় দোকানে নাই গেলে!

বনবিহারী বিশুষ্ক মুখে হাসে।— না গেলে খাবে কি?

—এমন করে মরে গিয়ে খাওয়াবার কি দরকার? আজ দোকানে যেতে পাবে না। শুয়ে থাক।

কাঁচকলার ঝোল ভাত খেয়ে বিকেলে যদি পার যেও। বনবিহারী মৃগনয়নীর দিকে তাকায়। একটু দাঁড়ায়। কি একটু ভাবে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—না। ঘুরেই আসি। মৃগনয়নী কিছু বলে না। আপনা-আপনিই বলে বনবিহারী,— বাবুর গালাগালটা বড় অসহ্য লাগে! এবেলা কামাই করে ওবেলা গেলে যাচ্ছেতাই করে বলবে। তখন কিষে মনে হয়—। মৃগনয়নীর আর কিই বা বলবার থাকতে পারে!

—ছেলেরা আর যাই করুক, চাকরী যেন জীবনে না করে।

বলে বনবিহারী। আর একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে ইচ্ছে আর হয় না। পা চলতে যেন আর চায় না। তবু যেতেই হবে যতক্ষণ বেঁচে আছে। নিশ্বাস থাকা অব্দি থামলে চলবে না। বিশ্রাম! দোকানের বাবু বলেন, মরে গেলে। তার আগে কামাই-টামাই করা কি চলে! মানে কর্ম্মক্ষেত্র তো'! কথাগুলো মিঠে মিঠে,— সবাই সংসারে কাজ করতে জন্মেছে। দোকান পাইলে বসে থাকা মানে কাজে ফাঁকি। ওটা ভগবানও সইবে না। আর মাত্র পঁয়তাল্লিস টাকা মাইনে দিয়ে এক একটা গরীব মানুষকে বারো ঘন্টা খাটিয়ে নেয়াটা ভগবান সইবে। কর্মক্ষেত্রে শুধু কাজ করাই কর্তব্য। টাকা পয়সার দিকে তাকিও না। কর্মযোগের এমন অপরূপ ব্যাখ্যাকে কেমন নিখুঁত ভাবে কাজে লাগিয়ে গেছে লোকটা তাবলে অবাক লাগে। উনি মালিক, উনি শুধু ব্যবসাই বেশী বোঝেন না, গীতাও বোঝেন বেশী। না বুঝলেও বেশী বোঝেন।

(ক্রমশঃ)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরেন ঘোষ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক নিঃসন্দেহে স্বর্ণযুগ। নাটক, প্রবন্ধ উপন্যাসে যেমন বাঙলা সাহিত্য উন্নীত হয়েছিল তেমনি সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিভাশালী স্রষ্টার সার্থক পদক্ষেপ পড়েছে। বাঙলা কাব্যসাহিত্য এই সময় সর্বাধিক পুষ্টি লাভ করে, সেই সঙ্গে গদ্য সাহিত্য ও বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে। তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক সাহিত্য ও এই সময় রচিত হয়েছে। কিন্তু এপথের পথিক সংখ্যায় নগণ্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যঙ্গরচনার প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়; উপরন্তু জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে ব্যঙ্গ শ্লেষের কষাঘাত প্রয়োজন। বাঙলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। পূর্বসূরীদের বিস্মৃত হওয়া আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাসের স্থূলগ্রন্থের অন্তরালেই আবদ্ধ রয়েছেন। আজ তাঁর নাম জানে অল্পলোক, তাঁর রচনা পঠিত হয় আরো অল্পসংখ্যক দ্বারা।

নেশায় আচ্ছন্ন জাতিকে জাগাবার জন্যে তীব্র কষাঘাত প্রয়োজন। জাতিকে আত্মসচেতন করতে হলে, ঘুম ভাঙাতে হলে 'স্যাটায়ারের' কষাঘাত সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। আজ সাহিত্য থেকে মননপ্রধান বুদ্ধি প্রসূত রচনা ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। কঠিনের সাধনা সাধ করে কজন করে? মনন প্রধান; শ্লেষাত্মক রচনায় ইন্দ্রনাথই একক এবং অগ্রগণ্য। সাহিত্যে লঘুকল্পনামূলক রচনার প্রাচুর্য, আমাদের মর্মাহত করে। চটুল রচনায় সাহিত্যাকাশ আকীর্ণ। ভাবলে বিস্মিত হই, শতবর্ষ পূর্বে ইন্দ্রনাথের রচনায় যে তীক্ষ্ণতা ছিল, তার তুলনা আজো সহজে চোখে পড়ে না।

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সামান্য। অতি অল্প দিনেই তাঁর ঋণ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। শুধু সমসাময়িক কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তার স্থায়িত্ব কম হবেই। তৎকালীন সমস্যা ও সাময়িক ঘটনার ঊর্দ্ধে কখনো ওঠেননি ইন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরীর কথা। তীক্ষ্ণ বা প্রতিভাবান লেখক, বাক্‌বৈদগ্ধেই নিজেকে নিঃশেষ করেছেন। সমসাময়িক কাল নিয়ে এঁরা উভয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ স্থান পরিবর্তন করেছেন বহুবার। পূর্ণিয়া থেকে এলেন দিনাজপুরে। এখান থেকেই তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু। সাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গী হিসেবে পেলেন। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত হচ্ছে, ইন্দ্রনাথকে বলে তাঁর 'কল্পতরু' জ্ঞানাঙ্কুরে পাঠালেন তারকনাথ কিন্তু রচনাটি প্রকাশিত হল না। মনঃক্ষুণ্ণ ইন্দ্রনাথ সাময়িক ভাবে মসীচালনা বন্ধ করলেন। চলে এলেন কলকাতায়। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য "ভারত উদ্ধার কাব্য" রচিত হল।

মনে হয় চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা ইন্দ্রনাথের ছিল। কিন্তু তিনি সে পথে হাটেন নি। এতে আমাদের সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নিঃসন্দেহে। তৎকালীন প্রখ্যাত সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথকে Patriot satirist বলে স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কৃতী সমালোচকও ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সরস উক্তি করেছেন। Hary's Comet আখ্যায় তিনি ইন্দ্রনাথকে ভূষিত করেছেন। বিশ্বান, বুদ্ধিমান, জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধি,

দেশপ্রেমিক। কিন্তু সব থেকেও যেন কী নেই। ধূমকেতুর মত অলক্ষুণে, পুচ্ছবিশিষ্ট।

'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথের ছদ্ম নাম। তাঁর আগে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমের রচনা বড় বেশী গভীর, বড় বেশী বিদগ্ধ, সূক্ষ্ম ও দার্শনিক। কমলাকান্তে জ্বালা আছে হাস্যরসও আছে, ইন্দ্রনাথে সে জিনিসই কিছু স্থূল ভাবে পাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে Satire নেই, হয়ত রঙ্গ আছে কিছু। বিদূষক বা ভাঁড়ের ভাঁড়ামিতে যে পরিমাণ কৌতুক, তা মুহূর্তেই নিঃশেষিত হয়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এবং ভারতচন্দ্রের রচনায় কিছু হাস্যরস পাই কিন্তু বিশুদ্ধ Satire এবং farce পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই এসেছে। জীবনে যখন বৈপরীত্য দেখি, তখনি কৌতুকের সৃষ্টি হয়। অসংগতিই জন্ম দেয় শ্লেষ বা ব্যাঙ্গের। ভবানীচরণ প্যারীচাঁদের রচনায়, কিছু বা কালীপ্রসন্নের সাহিত্যে কৌতুকরস পাই। কিন্তু তারা ভারসাম্য রাখতে পারেন নি। ইন্দ্রনাথই এক্ষেত্রে সার্থক।

প্রথমদিকের Satire-এ আত্মসমালোচনা হয়েছে। নববাবু বিলাস নববিবিবিলাস, হুতোমপ্যাঁচার নকসা, আলালের ঘরের দুলালে আমরা আত্মসমালোচনা করেছি। তারপর বোঝা গেল যে আমাদের অন্য শত্রু আছে—সে ইংরেজ। সৃষ্টি হোল কমলাকান্তের রচনা। তারই স্থূল রূপ ইন্দ্রনাথ দিলেন তাঁর রচনায়। ইংরেজের বিরুদ্ধে, তার রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি লেখনীচালনা করলেন। তখন দেশ ও জাতির সংকটমুহূর্ত। এদিকে কংগ্রেস আন্দোলন, ওদিকে বঙ্গভঙ্গ। আত্মসমালোচনামূলক আলোচনা করলেন ইন্দ্রনাথ আবার ইংরেজকেও তীক্ষ্ম ভাষায় আক্রমণ করলেন।

বাঙলার তখন দুরবস্থা। সুরেন্দ্রনাথ Justice Norris সম্বন্ধে 'Bengali'-তে লিখেছেন— তাতে তাঁর কারাদণ্ড হয়। বঙ্গবাসীতে পঞ্চানন্দ লিখলেন 'সুরেন্দ্রায়ণ'। কেশবচন্দ্র তখন ঘর ও বাহির উভয় দলকেই চটিয়েছেন। তিনি বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও নিজের কন্যার বাল্যবিবাহ দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে হৃদ্যতা করায় ব্রাহ্মসমাজও তাঁর বিরুদ্ধে। অনেক সদ্‌গুণ থাকাসত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের বিরোধী পক্ষ দেখা দিয়েছে। ইন্দ্রনাথ কথায় কথায় তাঁকে আক্রমণ করেছেন। ব্রহ্মদের প্রতি বেশিই রুষ্ট ছিলেন তিনি। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর কটূক্তি হৃদয় বিদারক হলেও হাস্যোদ্রেক করে। কেশবচন্দ্রকে তিনি বলেছেন,—"যীশুর ছোট ভাই, সিদ্ধার্থের হাড়িফেলা জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়ো সেনজা।"

ইন্দ্রনাথ লিখেছেন তিনি হাসাবার জন্যে লেখেন নি, কারণ বাঙলার ঘোর দুর্দিনে হাসা উচিৎ নয়। ইন্দ্রনাথের হাসির অন্তরালে অশ্রুর প্রবাহ রয়েছে। কিন্তু তাঁর আঘাতই হয়েছে বেশী। যে সাহিত্য প্রেমমূলক নয়, শুধু আঘাতই করে, তার স্থায়িত্ব কম। তবু স্মরণ রাখতে হবে, ইন্দ্রনাথ সাধু উদ্দেশ্যে স্যাটায়ারি করেছেন।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে বঙ্কিমকে অনুকরণ করেছেন ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি দার্শনিক ছিলেন না। তাই বঙ্কিমের sublimity আসেনি তাঁর রচনায়। কিন্তু খাঁটি দেশাত্মবোধ ও মর্মজ্বালা ইন্দ্রনাথকে অমর করে। তিনি কাউকে ছাড়েন নি। একদিকে ইংরেজকে আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে বাঙলার তথাকথিত ভীরুভণ্ড দেশপ্রেমিকদের। কিন্তু জীবনের খণ্ডতার প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশী, পূর্ণাঙ্গ চিত্ররচনায় তিনি সার্থক হন নি। সাময়িক পত্রের দাবী মেটাতে না হলে হয়ত তেমন কিছু রচনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হোত না।

ইন্দ্রনাথ বাঙ্গবিদ্রূপে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে আসেন। ইংরেজ শাসনের বিচার বিভ্রাট, অসাধুতা, ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সামাজিক দুর্নীতি, ব্রাহ্মধর্মের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ—এইগুলি তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়। 'পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ,' দুষ্টের দমনবিধি, নববর্ষ প্রভৃতিতে

বঙ্কিমের প্রভাব বেশী। ইন্দ্রনাথ বলেছেন, দুর্ভিক্ষনিবারিত হতে পারে যুদ্ধ দ্বারা।

শূন্যগর্ভ স্বদেশসেবার বিরুদ্ধে পঞ্চানন্দ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। 'ভারত উদ্ধার কাব্য' ও 'ভলাণ্টারী কাব্য' তার নিদর্শন। ভারত উদ্ধার কাব্যে দেখি কামিনীকুমার—বিপিনকৃষ্ণের ভারত উদ্ধার প্রয়াস। অভিনব উপায়ে এরা উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতালাভের জন্যে যুদ্ধযাত্রার বিদায় মুহূর্তে বিপিনকৃষ্ণ স্ত্রীর কাছে কেঁদে আকুল। গৃহিনী সান্ত্বনা দিলেন—'এতই অমূল্যধন স্বাধীনতা যদি,—নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে—আমারেই দাও নাথ।' বিপিনকৃষ্ণ বলেন— "যাত্রাকালে নেত্রজল বাঙ্গালী কল্যাণ।" এবং তার পণ—হ'টাইয়া দিব আজি পাষণ্ড ইংরাজে।" অবশেষে গৃহিনী বলেন—"আলু ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া।" তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের হাস্যজনক দিকটি ফুটেছে 'ভারত উদ্ধার কাব্যে'।

বাঙলার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু'। তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় তৎকালীন পাঠক সমাজে মত্ততার সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও উক্ত গ্রন্থের প্রশংসা করেন। কিন্তু কুরুচির আধিক্য কোন কোন সমালোচক একে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতে চান না। বঙ্কিম ইন্দ্রনাথের অনুসরণে মুচিরাম গুড় চরিত্র অঙ্কন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। ইন্দ্রনাথের রচনার স্থানে স্থানে স্থূলরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পুরোপুরি ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি। মূলতঃ তিনি হাস্যরসিক। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে 'সুরুচির সাঁকো' 'ভ্রমিকায়'—চিরন্তন হাস্যরস পাওয়া যায়।

আজ আমাদের জীবনে তিক্ততা গ্লানি, হতাশা অসংগতি, ব্যর্থতাবোধ— কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত তেমন একজন তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের বড় অভাব— যিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতাকে দেখিয়ে দেবেন, এবং ব্যঙ্গের কষাঘাতে চেতনাকে জাগাবেন ঘুম ভাগিয়ে। হাস্যরসের প্লাবনেই আমাদের মনের জড়তার পাঁক ভেসে যেতে পারে আর সেখানে প্রস্ফুটিত হতে পারে উজ্জ্বল শতদল। হাস্যরসিক জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখে থাকেন, তবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে। "The humourist sees life more widely and wisely than any of the seers. It is not an intense and narrow nature; the humourist can guess at the totality of the World's life."

বাংলার ইতিহাস

বঙ্কিমচন্দ্র একদা দুঃখ করে বলেছিলেন বাঙ্গালীর ইতিহাস নেই। ছিলনা সত্যিই। তাই আঠারো ঘোড়সোয়ারে নবদ্বীপ জয়, আর দুশো সায়েব ঘরে বন্ধ হয়ে মরার গাঁজাখুরি গল্পই বাংলার ইতিহাস হয়ে দাঁড়ালো, অনার্য বাংলার শশাঙ্ক হলেন খুদে বিশ্বাসঘাতক জমিদার— এই ইতিহাস পড়লে বাঙ্গালী বেশ কিছুকাল। জানলে বাঙ্গালী বরাবর কাপুরুষ, কিছু লেঠেল ছিল বটে একসময়, তারাও বামুন কায়েত নয়; আর বামুন কায়েতই যখন আসল জাত তখন ওগুলো হিসেবের মধ্যে ধর্তব্য নয়—অতএব বাঙ্গালীর ইতিহাস ওই পর্যন্তই।

ক্রিয়া ঘটলেই প্রতিক্রিয়া—উনিশ শতকের শেষে আর বিশ শতকের গোড়ায় বাঙ্গালীর গৌরব ঘোষণার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন বাংলার দেশপ্রেমিক লিখিয়েরা। ফলে উৎসাহের আধিক্যে মাত্রাজ্ঞান লুপ্ত হলো। নভেল নাটকের নায়ক হলো সীতারাম প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলার লম্বা বক্তৃতা এমেচার পার্টির লায়েক অভিনেতারা হরদম ঝাড়তে লাগলো। নাট্যকারদের কল্পনার ধোঁওয়ায় এদের আসল রং মিলিয়ে গেল। দেশের জন্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল, হায় বাংলা হায় বাংলা রব উঠলো— গিরিশ ঘোষের নাটকে মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে বারুদে জল ঢালতে লাগলো। সেই জলে বাংলার ইতিহাস ভেসে গেল।

তারপর গেল কিছুকাল। আহা বাংলা উহু বাংলার দল যখন আহা উহু করে একটু ঝিমিয়ে পড়লো তখন একদল লোক এলো খোন্তা কুড়ুল নিয়ে— সে খোন্তা কুড়ুল তাদের বুদ্ধি আর বিচার শক্তি। নানা সূত্র থেকে ইতিহাসের আসল চেহারাটা খোঁজা হতে লাগলো। রাখালদাস, হরপ্রসাদ, যোগেশ বিদ্যানিধি, যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার, হেম চৌধুরীর দল পুরোনো জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে সাফ করলে। বাঙ্গালী যা ছিল তার একটা আসল ছবি পাওয়া গেলো— সবটা না হোক তার রেখা খানিকটা তো বটেই।

বাঙ্গালীর ইতিহাস হলো। সমস্যা মিটলো। কিন্তু মরিয়া না মরে রাম— আবার নতুন সমস্যা এলো— বাঙ্গালীর ইতিহাস এখন পড়ে কে?

স্কুলে কলেজে গ্রীস রোম ইংলন্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস চল্‌লো। আজও চলছে। মুখের কথা যার ভাল করে ফোটেনি সেও মুখস্ত করছে 'রিনাইস'সে'র শ্রেষ্ঠ শিল্পী লোনার্দো দ্য ভিঁচি, রাজনীতির ধুরন্ধর নেতা ম্যাক্যাভেলী। অষ্টম হেনরীর অষ্ট পত্নী একথা তাকে মনে রাখতে হয়। মার্টিন লুথার কে, দান্তে বিয়েত্রিচেকে কবার দেখেছিলেন, হাস্যমুখী মোনালিসা কোন ম্যুসিয়মের সম্পত্তি নিখুঁত জানা চাই। নইলে বিদ্যা অসম্পূর্ণ—প্রতিফলে পরীক্ষাপত্রে একটি নিদারুণ নিষ্কোণ গোলক।

এ হেন ব্যস্ততার মধ্যে বাংলার স্থান কই! বাংলার ছেলে বাংলার সত্যকার ইতিহাস পাছে পড়ে ফেলে—পাছে জেনে ফেলে বাঙ্গালীর নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব মনীষা, বন্ধ্যা নয় অনুর্বরা নয়, অতএব ও ইতিহাস চাপা থাক। চৈতন্যের চেয়ে লুথার পড়ুক, রামমোহনের চেয়ে বেন্থাম মিলকে জানুক। ফলে যা হবার তাই হলো। মোটামোটা ইতিহাস মুখস্ত করেও মাটিতে পা পড়লোনা।

তারিখের যক্ষপুরীতে বাঙ্গালী ছেলের মন হারিয়ে গেলো। রাজরাজড়ার লড়াইতে পদাতিকরা মরলো পাঠকদেরও মাথা গোলমাল হয়ে গেল। বাংলার গাঁয়ে বসে কেরাসিনের হারিকেন জ্বালিয়ে পড়া ইতিহাসের বাইজেনটাইন বাইরের কালো আকাশের মতই কালো হয়ে গেল।

তাই বলছিলুম বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে— কিন্তু পড়ে কে? দূরের কথা নয়— এই তো একশো বছর রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ কি প্রবল প্রাণের সমারোহ— আদর্শের জন্য কি অকুন্ঠ সংগ্রাম— কিন্তু পড়ে কে? রামমোহনের সমসাময়িক বাঙ্গালীর নাম জানতে চাইলে বি, এ, অনার্সের ছাত্র জবাব দেয় দেবেন ঠাকুর আর কেশব সেন। বিদ্যাসাগর কি বই লিখেছিলেন জানতে চাইলে জবাব দেয় বাংলা মহাভারত। ধ্যানের বাংলাদেশ, কর্মের ও সাধনার বাংলা দেশকে বাঙ্গালী আর জানতে পেলোনা তাই বোম্বাই কালচারের জোয়ারে ভেসে পাটোয়ারী রাজনীতির খোঁয়াড়ে ঢুকছে বাংলা দেশ।

ইতিহাসের জোয়ান জোয়ান পন্ডিতেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ো আলো করে বসে আছেন— আর রাজত্ব চালাচ্ছেন দেশপ্রেমিকেরা দেশের প্রেমে যারা মাতাল। স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের ইতিহাস লেখা দরকার হলো। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র বাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিলেন। স্বাধীনদেশ—চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে কালক্ষেপনের মত নির্বোধ নন শিক্ষামন্ত্রী। কেন্দ্রিয় সরকার কমিটি বসালেন— তার মারফতে সরকারী হস্তক্ষেপ চলতে লাগলো— ইতিহাসের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা হতে লাগলো যেমন হয়েছে হিটলারের আমলে, আরও ঢের বেশি করে স্ট্যালিনের আমলে। ফলে ইতিহাস লেখা হলো না।

মোটকথা এই যে, বাংলার ইতিহাস বাংলায় পাঠ্য করতে হবে। বাঙ্গালীর ছেলেকে জানতে দিতে হবে যে এই বাংলা তার দেশ— এর শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য তার নিজের। জানতে দিতে হবে সেই প্রতিভার মনীষীদের যারা সত্যিকরে দেশকে ভাল বেসেছিলেন। খবরের কাগজে যাঁদের সফরের ফলাও বিবরণ ছাপার প্রয়োজন হয়নি— যাঁদের বক্তৃতা দুঃস্থ শিক্ষিত লোকে অল্প পয়সার জন্যে লিখে দেয়নি—তাঁদের জানতে হবে।

আদর্শবাদের অভাব বাঙ্গালী জীবনকে আজ পঙ্গু করেছে সেই আদর্শবাদ ফেরাবার, উপকরণ আছে তারই জীবনের মধ্যে। সেই জীবনকে যথার্থ গৌরবে সমুচিত ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলে ধরলে আলো জ্বলবে তরুণ বাংলার মনে— তাই বলছি বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালীর স্কুলে কলেজে পাঠ্য হোক। বঙ্কিমচন্দ্র আজ বেঁচে থাকলে লিখতেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে পড়িবার লোক নাই। পড়াইবার ইচ্ছা নাই।"

সোমেন বসু

মার্কিন ক্ষুদ্র-শিল্প প্রদর্শনী

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে। যেখানে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশী সেখানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজন কতখানি —ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত শ্রমনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বহুসংখ্যক লোক সরাসরি কাজ পেতে পারে। জাতীয় আয় অপেক্ষাকৃত সমভাবে বন্টনের নির্ভরযোগ্য পন্থা রয়েছে

এই ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে; তাছাড়া, পুঁজি এবং শ্রমসম্পদ এ দুটোই সংগ্রহ করে কাজে লাগাবার সুযোগও পাওয়া যায় ক্ষুদ্র শিল্পের ভিতরে—যা না হলে এগুলির হয়ত অপচয় ঘটত"। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের দেশের দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প। আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য ও বিপুল জনসংখ্যা। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে চাই সুপরিকল্পিত শিল্পক্রম যাতে অধিকতর খাদ্য, পণ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। দেশে বিরাট ভারী যন্ত্র শিল্পের কারখানা চালু করলেই সমস্যার সমাধান হবেনা। প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুর মতে "এতে ভারতের শ্রমিক গোষ্ঠীর এক ভগ্নাংশের মাত্র কর্মসংস্থান হতে পারে।" ভারতের বিপুল শিল্পায়ণের অঙ্কুর নিহিত আছে এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যেই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত শিল্পোন্নত হয়েছে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে। ঐদেশে প্রায় কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্রাবয়ব শিল্প সংস্থা আছে। বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাবয়ব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে থাকে। ওই দেশের জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানী প্রায় ১৭ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা থেকে, ষ্টীল কর্পোরেশন প্রায় ৫৪ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় বিবিধ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ক্রয় করে থাকেন। সুতরাং এই ধরণের ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কত বিচিত্র ধরণের মূলধনী ও ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন, বৃহৎ শিল্পের সাহায্য এবং দেশবাসীর কর্মসংস্থানে বড় রকমের অংশ গ্রহণ করছে।

ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পের পরিমাণ যত বেশী হবে পণ্যের উৎপাদন, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষও তত বৃদ্ধি পাবে। পণ্যের মূল্যও হ্রাস পাবে। নব নব পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে কর্মক্ষেত্রের প্রকাশ ঘটাবে। বর্তমানে শিল্পে মামুলী পন্থায় নিছক দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে থাকলে বিশ্বের বাজারে আমরা মুখোমুখি কখনও দাঁড়াতে পারবনা। তাই সমস্ত শিল্পে, তা সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে উৎপাদন ও উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করেনা। তার নির্ভর যন্ত্র উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর এরই সাহায্যে শরীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ।" মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞানের দান কতখানি তার সঙ্গে পরিচয় করে দেবে "আমেরিকার ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী।"

গত ১৫ই মার্চ কলিকাতায় ক্যাথিড্রাল রোড ও লোয়ার সারকুলার রোডের সংযোগস্থলে সুদৃশ্য বৃহৎ মন্ডপের ভিতরে ও বাইরে আমেরিকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। এছাড়া আরও চারটে ছোট বড় মন্ডপে প্রদর্শনীর শিশুবিভাগ, কৃষি, বাণিজ্য তথা সরবরাহ কেন্দ্র প্রভৃতি আছে।

প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সৌরশক্তি বিভাগ। কি করে সূর্যের কিরণ থেকে শক্তি আহরণ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি বিনাব্যয়ে চালানো যায় তা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। সূর্যের কিরণ থেকে ৩০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ উৎপাদন, রান্নার জন্যে সোলার ওভেন ও কুকার, টেলিফোন, রেডিও, বধিরের শ্রবণশক্তি সহায়ক যন্ত্র প্রভৃতি চালানো সম্ভব, তাপউৎপাদন যন্ত্রগুলি আকারে অত্যন্ত বড় হওয়ায় গৃহস্থালীর কাছে কতদূর লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ, থাকলেও ছোট বা মাঝারি শিল্পে এর উপযোগিতা আছে যদিও এর পরিচয় আমাদের দেশে নূতন কিছু নয়। কিন্তু সিলিকন সেলের উপরে প্রতিফলিত সূর্যকিরণকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে হিয়ারিং এড্, রেডিও, টেলিফোন প্রভৃতি ব্যবহার করা

আমাদের দেশে নূতন, এতে প্রাথমিক খরচ বেশী হলেও ব্যবহারিক খরচ অত্যন্ত কম কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত মোটেই নেই।

প্রধান গম্বুজাকৃতি মন্ডপে রয়েছে ছোটখাট শিল্পে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় এমন কতকগুলো যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে গোল্ড প্লেটিং শপ্ ইলেক্ট্রোল্যাইট প্রসেস্ ট্যাঙ্ক, হাইড্রলিক ষ্ট্রেটনিং প্রেস, ইলেক্ট্রনিক অটো টিউন আপ ক্লিনিক, স্পট ওয়েল্ডার, কাঠের কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও ইম্প্যাক্ট্ গ্রাইন্ডার অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এই মন্ডপে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরা চালিয়ে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি করে এই সব ছোটখাটো যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন বাড়ে, চাকুরীর ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, শ্রমিকের আয় বাড়ে এবং ব্যবসায়ের বৃদ্ধি পায়। বাইরের প্রাঙ্গণে ফর্ক-লিফ্‌ট, ক্রেণ প্রভৃতি শ্রম লাঘবকারী যন্ত্রপাতির উপযোগিতা দেখানো হয়েছে।

কৃষি বিভাগে আমেরিকার কৃষি বিশেষজ্ঞ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি, পশুপালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, গম, সয়াবীন প্রভৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিশুজগতে আছে একটি আদর্শ নার্সারী। তাছাড়া শিশুদের মনের ও স্বাস্থ্যের সৌকর্য্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আধুনিক পদ্ধতিগুলো দেখানো হয়েছে।

উপসংহারে বলছি যে প্রধান মন্ডপে চালু যন্ত্রপাতির তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজের মধ্যে প্রতোক ষ্টলে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা তাঁদের স্কন্ধে লম্বমান লাউড স্পীকারের সাহায্যে যন্ত্রপাতির পরিচয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। সত্যিকথা বলতে কি তাঁদের এই প্রয়াস পন্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। যন্ত্রপাতির কর্কশ আওয়াজ ও প্রায় ৩০।৪০টা লাউড স্পীকারের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একসঙ্গে প্রচার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশাতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। বরঞ্চ দেয়ালে আঁটা পোষ্টার ও কর্তৃপক্ষের দেওয়া সুভেনীর আমাদের সহায়তা করেছে বেশী। দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিষয়ে বক্তব্যগুলি ইংরেজীতে বলা হয়েছে। শিশুবিভাগেও তাই। সুতরাং এর কার্যকারিতা আমাদের দেশের লোকেরা কিভাবে গ্রহণ করেন তার উপরেই নির্ভর করবে। যাইহোক আলোচ্য শিল্প প্রদর্শনীতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দেখানো হয়েছে তার সবই আমাদের দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং এতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে প্রচুর। প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্যে খোলা থাকবে আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত।

নির্মলেন্দু সান্যাল

স মা জ স ম স্যা

বিকেলের আলো

সমাজের হাজারো সমস্যা আছে। তার মধ্যে হঠাৎ বিকেলের আলোর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল কেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আমাদের কাছে কিন্তু বিকেলের আলো কবিতার সমস্যা নয়। নেহাৎ সামাজিক সমস্যা। বিকেলের আলো তুচ্ছ করবার নয়।

মনের ভালো লাগা বাদ দিয়েও, স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন, বিশেষত চাকুরীজীবীদের স্বাস্থ্যের কথা। নিঃসন্দেহে শোচনীয়। এই স্বাস্থ্যের অবস্থা শুধু বর্তমানের সমস্যা নয়। ভবিষ্যতেরও ভাবনা। কিছুটা খেলাধূলা বা মুক্ত বাতাসে বেড়ান প্রত্যেকের দরকার এবং এজন্য বিকেলই প্রশস্ত সময়। (আজকাল কড়া বৈদ্যুতিক আলোয় যে খেলাধূলার ব্যবস্থা হচ্ছে তা স্বাভাবিক নয়। এবং সম্ভবত স্বাস্থ্যকরও নয়।) বিকেলের মৃদু রোদ শুধু সুন্দর নয়, দেহ এবং মনের পক্ষে অতীব পুষ্টিদায়ক। কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়ার পর কজন এই বিকেলের রোদ উপভোগ করতে পারেন?

এই যে প্রয়োজন, এই প্রয়োজন মেটানর বাধা কোথায়? মনে হয় একটা বাধা আমাদের গতানুগতিকতায় বন্দী মানসিকতার মধ্যেই। বিকেল পাবার জন্য অফিসকাছাড়ীর সময় বদলান দরকার, হয়ত বা সময় সংকুচিত করার প্রয়োজন। কিন্তু একথায় কর্তারা ত আঁৎকে উঠবেনই, কর্মচারীরাও অনেকেই হয়ত নিজেরাই সংকুচিত হবেন। কিন্তু কেন? আগে একটা যুগ ছিল (যার জের এখনও চলছে) যখন চাকুরীর ভিত্তি ছিল মালিকের ব্যক্তিস্বার্থ এবং কর্মচারীর নিরুপায় প্রয়োজনের সংমিশ্রনে। কর্মচারীকে কোন নির্দিষ্ট কাজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী মালিকের আজ্ঞাধীন থাকতে হত। তার পোষায় ভাল, নচেৎ বিদায় হও। এক্ষেত্রে কর্মচারীর স্বাস্থ্য বা সুবিধা-অসুবিধার কথা অবান্তর। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ত বটেই কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রেও চাকুরীর চুক্তির মধ্যে অনুল্লিখিত থাকলে কর্মচারীর সুখ-সুবিধা প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই প্রয়োজন হলে অবশ্যই অফিসের কাজের সময় সংকুচিত করতে হবে।

এই সময় সংকোচনে হয়ত কাজের ক্ষতি হবে; কিন্তু তা সময়ানুপাতে আংশিক হবারই সম্ভাবনা। বেশী সময় খাটালেই বেশী কাজ পাওয়া যাবে এই ধারণা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর অচল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বরঞ্চ কাজের সুসম ব্যবস্থায় কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কর্মচারীদের সুস্থ এবং সুখী রাখা সুসম ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই কাজের সময়ের প্রাপ্তিক সংকোচন অন্যদিকে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত এ প্রশ্নও রাখা চলে—সাধারণত দশটা থেকে পাঁচটার মধ্যে বিভিন্ন অফিসের যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তার জন্য সত্যিই কি এত সময়ের প্রয়োজন? যেমন, একই কাজের পৌনঃপুনিকতায় কি অধিকাংশ অফিসে প্রচুর সময়ের অপব্যয় হয়না? একটি সামান্য প্রাপ্তিসূচক চিঠিও সই করার আগে চারপাঁচজন কর্মচারীর হাত ঘুরে আসে এটা আমরা অনেকেই দেখেছি।

যাই হোক, এ-যুগে একটা কথা মনে রাখতেই হবে—মানুষের বেঁচে থাকার জন্যই চাকরী, চাকরীর জন্য মানুষ বেঁচে থাকেনা, এবং সেই বেঁচে থাকার অর্থ কোন রকমে টিঁকে থাকা নয়, বেঁচে থাকার মানে সুস্থ এবং পরিপূর্ণভাবে বাঁচা। সেই রকম বেঁচে থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ও জীবিকার সময় নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

বিকেলের আলো তাই কাব্যিক দাবী নয়,— সামাজিক প্রয়োজন। দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের খাতিরে আমরা বৈকালিক সময় সাধারণলভ্য করার কথা বলেছি। দৈহিক স্বাস্থ্যের যুক্তি সহজবোধ্য, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখ আরো একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

অভিজ্ঞতাসূত্রে সকলেই একথা মানবেন যে দশটায় অফিসে যোগ দিতে হলে অধিকাংশের পক্ষেই সকাল বেলায় শিক্ষিতজনোচিত কোন গুরুতর বিষয়ের অধ্যয়ন, শিল্পকলা বা সাহিত্যের চর্চা কিম্বা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার অনুধ্যানের উপযোগী যথেষ্ট সময় থাকেনা। এজন্য একমাত্র সন্ধ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একথাও সকলেই মানবেন যে দশটা-পাঁচটার খাটুনির পর মধ্যবর্তী কিছুটা সময় খেলাধূলায় বা অন্যভাবে মনের গ্রন্থিমোচন না করলে এই ধরণের সাংস্কৃতিক বা সমাজকল্যাণসূচক অনুশীলন অসম্ভব, কারণ অফিসের কাজের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। শনিবারের বিকেল এবং রবিবারের ছুটী সামাজিকতাতেই ব্যয়িত হয়, হওয়া উচিতও। কাজেই উল্লিখিত চর্চা বা অনুশীলনের সুযোগ দৈনন্দিন হওয়া কাম্য। বস্তুত দৈনন্দিন এবং নিয়মিত চর্চা ছাড়া অনেক বিষয়ের উপরই যথার্থ অধিকার জন্মে না। সাংস্কৃতিক রুচিও চর্চা-সাপেক্ষ। সাংস্কৃতিক চর্চা মনের প্রসার ঘটায় এবং মনকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কজন চাকুরীজীবী সাংস্কৃতিক চর্চা এমনকি যোগাযোগের সুযোগ পায়। বস্তুত সময়াভাবেই সাধারণ মানুষকে সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু কি অপরাধে সাধারণ মানুষ সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে? শুধু তাই নয়, অফিসের সময় দৈনন্দিন জীবনকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে মানুষ একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার বাইরে সমাজের বৃহত্তর এবং গভীরতর সমস্যাগুলির সম্পর্কে চিন্তা বা আলোচনার কোন অবকাশই পায়না (ট্রামে-বাসের মুখরোচক আল্গা আলোচনা ধর্তব্য নয়)। ফলে এমন দেখা যায় যে, কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের ধারণা কোন একজন অজ্ঞ অশিক্ষিতের তুলনায় কোন অংশে উন্নত নয়। দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করে তোলা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি, শিক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ থাকাও অত্যাবশ্যক, নচেৎ শিক্ষাই অর্থহীন।

অফিসের সময় সংকোচনের অনেক অসুবিধা থাকতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের সামাজিক প্রযোজনীয়তাবোধে যদি আমরা এই সময়ের পুনর্নির্ধারণ আবশ্যক বলে মনে করি তবে কোন বাধাই দুর্লঙ্ঘ্য নয়। মূলপ্রশ্ন বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে। সমস্যাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি আমাদের আছে কিনা তাই বিবেচ্য। মুস্কিল এইখানেই।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

স মা লো চ না

স্মরণীয় ঃ সুশীল রায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। ৮.।
বঙ্গ-প্রসঙ্গ ঃ সুশীল রায়। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮৯ মাহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা ৭। ৫.।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন বলতে শুধু গল্প-উপন্যাসই বোঝায় না। বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝতে হলে বাঙালীর মানস-প্রকর্ষের একটি সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে বর্তমানকালে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগটি নিতান্ত উপেক্ষিত বললেই হয়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, বঙ্গসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ এখনো উদঘাটিত হয় নি।

সুশীল রায়ের 'স্মরণীয়' গ্রন্থটি বঙ্গসংস্কৃতির তথা বাঙালী মনীষার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলার ঐতিহ্য পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে কেমন ঐশ্বর্যদীপ্ত ভাবের ফসল ফলিয়াছে, তেত্রিশজন সংস্কৃতি-নায়কের জীবনচর্যা ও কর্মসাধনার ইতিহাস আলোচনা করে লেখক তা দেখিয়েছেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতির সুবর্ণযুগ। কিন্তু সে ধারা যে পরবর্তীকালেও, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম মধ্যাহ্নেও, কতখানি সক্রিয় এই গ্রন্থে তার প্রকৃত দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি থেকে শুরু করে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী ও বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি যুগপরিক্রমা করেছেন লেখক। যে তেত্রিশজন মনীষীর সুপাঠ্য জীবনী এখানে সংকলিত হয়েছে, তাঁদের কর্মকৃতি ও জীবনচর্যার পার্থক্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্য। একটি সমৃদ্ধ ও মহান সংস্কৃতির ঐতিহ্য যাঁরা কর্মে মননে ও জীবনে বহন করেছেন, তাঁদের জীবনবোধ একই মহৎ প্রতিশ্রুতিতে চিহ্নিত। তাই 'স্মরণীয়' শুধু কতকগুলি জীবনীর সংকলনই নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ও বটে।

তবু জীবনীকথার রসও এখানে অনুপস্থিত নয়। কিন্তু কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশ করে লেখক তাঁর রচনাগুলিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। তিনি বিষয়কে শ্রদ্ধা করেছেন ও রসিকের মন নিয়ে বাঙালী ও বাঙালীর কীর্তিদীপ্ত ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মনীষীদের জীবনসাধনার পরিচয় দিতে বসে তিনি নিজের হৃদয়স্পন্দনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। রচনাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীকথা বলা যায় না। এগুলি স্কেচ বা রেখাচিত্র জাতীয়, কিন্তু এই রেখাগুলি ঘিরে সহৃদয় লেখকের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র আলোছায়া-লীলা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এখানে শুধু বক্তব্য বিষয়কেই পাওয়া যায় না, আর একটি 'উপরি পাওনা'-ও আছে—সেটি হল লেখকের প্রসন্ন মনের লাবণ্যলেখা। তাই কয়েকটি সামান্য রেখাচিত্রও শিল্প-সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে।

'বঙ্গ-প্রসঙ্গ' একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় 'সম্পাদকের

কথায়ঃ "বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বাংলার চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ বিভিন্ন সময় যেসব অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে তা সংগ্রহ করে একত্র করাই এই সংকলন-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এর দ্বারা বাংলাদেশের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।" আলোচ্য সংকলনটিতে পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত বাংলার চিন্তাশীল মনীষীদের প্রবন্ধসম্ভারে সংকলনটি সমৃদ্ধ। পুরোনো বই ও পুরোনো পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠার নীচে সংকলনের অনেকগুলি প্রবন্ধ হয়তো হারিয়ে যেত! তা ছাড়া, বাংলাদেশের বিচিত্র বিষয় নিয়ে এমন একটি সংকলন, এর আগে আর প্রকাশিত হয় নি। বাংলাদেশকে অবলম্বন করে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর চিন্তাচেতনার একটি মূল্যবান সংগ্রহ প্রকাশ করে সম্পাদক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রবন্ধগুলির বিচিত্র ভাবানুষঙ্গ থেকে বাংলা ও বাঙালীর একটি অখণ্ড মর্মবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

সম্পাদনার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক আলোকিত হয়ে উঠেছে। মৌলিক চিন্তায়, মননশীলতায় ও আন্তরিকতায় প্রবন্ধ-গুলি চমৎকৃত ও বিস্মিত করে। প্রবন্ধগুলির বক্তব্য ও গভীরতা স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার প্রধান কারণ হল শুধু ভাষার চাতুরী ও ভঙ্গির বৈচিত্র্য দিয়ে চোখ ভোলানোর প্রয়াস এখানে নেই। তাই একালের 'রমারচনা'-র পাশে প্রবন্ধগুলি অতীতকালের এক একটি মহৎ স্থাপত্যকীর্তি বলে মনে হয়। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশে যে জীবনোচ্ছ্বাসের প্রবলতা সূচিত হয়েছিল, এই যুগের চিন্তানায়কেরা তাকে স্থিরচিত্তে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে ভাষাতত্ত্ব ও বর্ণমালা পর্যন্ত বাংলা সম্পর্কিত নানা বিষয় তাঁদের কৌতূহলী করেছিল। তাঁরা দেশকে ভালবেসে তার কথা নানাভাবে চিন্তা করে-ছিলেন। যাঁদের প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে, তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিচিত্র-প্রসারী। কিন্তু নিজের দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির কথা তাঁরা বিস্মৃত হন নি। রামমোহন ও বিপিনচন্দ্রের কর্ম-পদ্ধতি ও কর্মক্ষেত্র এক ছিল না, কিন্তু নানা পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন একই তীর্থের তীর্থপথিক। সেই তীর্থবন্দনার মন্ত্র এঁদের সকলের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে—কিন্তু নানাসুরে নানাভঙ্গিতে।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থটি আর একটি কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় শতাধিক বছরের প্রবন্ধসংগ্রহ থেকে বাংলাপ্রবন্ধ সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক রূপ ও রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর থেকে বাংলা গদ্যের মেজাজ ও চেহারার বিচিত্র রূপান্তরগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামমোহন যখন প্রবন্ধ লেখেন, তখন বাংলাগদ্যের নিতান্ত শৈশব অবস্থা। কিন্তু ঊনিশ শতকের চিন্তা-নায়কদের স্নেহ-লালনে সেই গদ্যই যে কেমন করে এক জাগ্রত-জীবনের মহাভাষ্য রচনা করেছে, তার বিস্ময়কর ইতিহাস আলোচ্যগ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বাংলা গদ্যরীতির নানা বৈচিত্র্যও এখানে চোখে পড়ে। রামসুন্দরীর সরল সহজ আত্মকথা, দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির প্রসাদগুণ, বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তন, ভূদেবের যুক্তিনির্ভর অনলঙ্কৃত গদ্য, ব্রহ্ম-বান্ধব-বিবেকা-নন্দের গদ্যরীতির বলিষ্ঠতা ও ওজঃগুণ, অক্ষয়কুমার-দীনেশচন্দ্র-রাখালদাসের তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের আবেগ ও বুদ্ধির সমন্বয়, ভাষা ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সরস কথকতা, রামেন্দ্রসুন্দর-বলেন্দ্রনাথের রচনার স্নিগ্ধমধুর আবেদন, প্রমথ চৌধুরীর বক্রতির্যক শ্লেষগাঢ় স্টাইল, অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মসুকুমার কাব্যধর্মিতা প্রভৃতি বাংলাগদ্যের বিচিত্র আস্বাদন সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

'স্মরণীয়' ও 'বঙ্গ-প্রসঙ্গ'—একটি মৌলিক রচনা, আর একটি সংগ্রহ। কিন্তু এ দুয়ের

মাঝখানে আছে তবু মিল'। উভয়ক্ষেত্রেই বাঙালী ও বাংলাদেশকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা হয়েছে—এক কথায় দুটি বইয়েরই উদ্দেশ্য এক, বঙ্গদর্শন। সুশীলরায় কবি ও গল্পলেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ দুটি তাঁর আর একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করবে। বর্তমানকালেও যাঁরা স্বদেশ ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও সত্যকে গভীর হৃদয়াবেগ ও অকুণ্ঠিত মমতার সঙ্গে অর্চনা করে চলেছেন সুশীল রায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর এই দুটি বই নিঃসন্দেহে বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করবে। গ্রন্থ দুটির বহুল প্রচার হোক,—এই প্রত্যাশা রইল।

রথীন্দ্রনাথ রায়

আলোর আকাশ : সুশীলকুমার গুপ্ত—প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, দাম দু'টাকা।

সৈনিকের প্রার্থনা : (দ্বিতীয় পর্ব) চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়,—প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী গ্রন্থাগার—৬, বেনিয়াপুকুর লেন—কলিকাতা ১৪, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নীলপাতা : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—প্রকাশক কালীমোহন ভাদুড়ী, গ্রন্থভবন, কলিকাতা—৯, মূল্য এক টাকা।

কাব্যকাহিনী : শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক শ্রীভূজেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী ৬।১ সুইনো স্ট্রীট কলিকাতা—২৬, মূল্য এক টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপথ আজ যে নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। দুর্বোধ্য, অর্থহীন কেবলমাত্র কয়েকটি বিচিত্র শব্দকে পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়ে, তাকে মহান কবিতা বলে চালানোর যে অপচেষ্টা একদিন কাব্যক্ষেত্রে দানা বেঁধে উঠেছিল, আজ তার কোলাহল স্তিমিত। সুস্থতার প্রাঙ্গণে কবিতার এই প্রত্যাবর্তন, নিঃসন্দেহে নতুন আশা উজ্জীবিত করে।

কিন্তু একথাও সত্য, এই বিশেষ অধ্যায়ের স্রোত থেকে যে পলিমাটি পড়ল, তার উর্বরতা, নতুন ফসলের পুষ্টির পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছে আজ। বর্তমান কবিতার মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন নিটোল অবয়ব গড়ে উঠছে, কম কথায়, কম পরিধিতে সুন্দর ভাবে, সুন্দর আঙ্গিকে ভাব প্রকাশের অধিকার আজ নতুন কবিরা আয়ত্ত করেছেন। সম্ভবতঃ এইটুকু পরমলাভ আমরা পূর্ববর্তী কাব্য-অন্দোলনের ধারা থেকে পেয়েছি।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "আলোর আকাশ" এর কবি সুশীলকুমার গুপ্ত কাব্যক্ষেত্রে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিতার উপকরণ মোটামুটি দু'টি জগৎ থেকে সংগৃহীত, এক গ্রাম্য প্রকৃতি থেকে এবং দ্বিতীয় প্রেমের স্পর্শ থেকে। কবির লেখার মধ্যে প্রসাদগুণ, শব্দ নির্বাচন, এবং সর্বোপরি একটি স্নিগ্ধ শান্ত ভাব ও সুর পাঠক মনকে মুগ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আনন্দের আকাশ অতি সীমিত। এই প্রায়ান্ধকার পরিবেশের মধ্যে "আলোর আকাশ" সত্যি ক্ষণিক মুক্তির সংগীত নিয়ে আসে। যদিও কবিতার বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি রসাস্বাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তবু এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

"স্বর্গাদপি গরীয়সী" একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা। তাঁর হাতে যে ছবি এখানে সৃষ্টি হয়েছে, তার আলোকে আমরা আমাদের সকলের মাকেই প্রত্যক্ষ করি। সেই মা, "ঘুচায় কল্যাণী

হাতে জীবনের ধূলি মলিনতা"। সেই মা, "সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে আলোকিত করে ইতিহাস"। সেই মায়ের স্নেহের সুধা থেকে সংসারের কেউই বঞ্চিত হয় না :

"বাগানের চারাটিও মায়ের স্নেহের কণা পায়;
পায়রার ঝাঁক এসে নির্ভয়ে মায়ের হাত থেকে
ধান খেয়ে উড়ে যায়। নিকানো ঘরের আঙিনায়
মা আঁকে আল্‌পনা মৃত্যু ধ্বংসের স্বাক্ষর সব ঢেকে।"

মায়ের স্নেহের আঁচলের ছায়া দিয়ে কবি তাঁর সারা কবিতা ঢেকে দিয়েছেন। একটি নিবিড় তৃপ্তি, আসন্ন সন্ধ্যার সংগীতের মত একটি অনাস্বাদিত শান্তি এখানে হৃদয়কে মুগ্ধ করে। এর বেশি কবিতার কাছে আর কি চাই জানিনা।

প্রকৃতির চিত্র চিত্রণে কবির শিল্প নৈপুণ্য অনস্বীকার্য : দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

"দূরে সমাহিততরণীর
আলোর আঙুলে লেখে আঁধারের বুকে প্রিয় নাম"
"উঠানে বাতাবিলেবু গাছে ঠেশ দিয়ে স্থিপ্রহরে
রূপসী রোদের গল্প পড়ে",

কবির প্রেমের কবিতাগুলিও খুব ভাল লেগেছে। ভালবাসার বেদনা নিয়ে লেখা কয়েকটি কবিতা গভীর ভাবে মনকে নাড়া দেয়।

"সারাদিন কোনো মতে ভুলে থাকি জীবনের তীরে
হিসাব নিকাশ নিয়ে; রাত্রি হলে প্রাণের গভীরে
সুতীব্র শূণ্যতা জাগে; মনে হয় সমস্ত জীবন
তোমার প্রেমের ছন্দে পেতে পারে দীপ্ত উদ্বোধন।" (অধিস্মরণীয়)

সামাজিক অন্ধকারের বাস্তব ছবিগুলিও তাঁর কবি মনে তীব্র বেদনার ছায়া ফেলেছে। কিন্তু এই ধরণের কবিতা সাধারণতঃ কেবলমাত্র মিছিলের চীৎকারে বা আওয়াজে পরিণত হয়, কবিতার স্তরে উন্নীত হয় না। শক্তিশালী অথচ সত্যিকার কবি মন ছাড়া এই সব বিষয়বস্তু নিয়ে সার্থক কবিতা রচনা করা কঠিন।

মাধবী এমন একজন মহিলা যাঁকে একটি কুৎসিৎ জীবন কাটাতে হয়। তার ঘরে 'নরক লীলা' চলে রাত্রিতে—

"আলো পোড়ে, বোতল বোতল মদ চলে, গান খসে, হাওয়ায় ফোঁপায় পর্দা, রোগের জীবানু জীবনের রক্তশোষে * * প্রবঞ্চক প্রেমের জুয়ায় যৌবন তিথারী হয়" (জানালা) জীবনের এত নিষ্পেষণের মধ্যেও তার একটি মন বেঁচে আছে, যে মন জানালাটি খুলে একবার আকাশের দিকে চায়। এই জানালাটি শুধু তাকে কখনো প্রতারণা করে না। বিষয়বস্তুটি খুব সুন্দর। কবিতাটিও ভাল লেগেছে।

এই ভালোলাগা দিয়েই 'আলোর আকাশ'এর সমালোচনা শেষ করলে হয়ত ভাল হ'ত, কিন্তু কবির কাছে সমালোচকের একটু নিবেদন আছে। প্রথম হ'ল, কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্রের অভাব আছে। অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয়।

দ্বিতীয় হল—আলোর আকাশের কবিতাগুলির কোন বিশেষ character নেই। ভাল কবিতা, মিষ্টি কবিতা সবই বুঝলাম। কিন্তু লেখকের সৃষ্টির মধ্যে যদি কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য না থাকে তবে তিনি ভীড়ের একজন মাত্র—হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে অসম্ভব নয়। আজকাল যাঁরা ভাল কবিতা লিখছেন তাঁরা প্রায় সকলেই এই একই ধরণের কবিতা লিখে

চলেছেন। কবিতা পড়লেই-জানা যাবে এইটি অমুক কবির কবিতা—তাঁর কবিতা ভীড়ে হারিয়ে যাবে না—নিজের একটি বিশেষ জগৎ সৃষ্টি করবে, স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করবে—এইটিই ভবিষ্যদ্বাণী।

তৃতীয় হ'ল—কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রৌদ্র-জ্যোৎস্না"র প্রকাশ কাল ১৩৫৮ সাল। বেশ কয়েকবছর পরে তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে কবিতাগুলির কোন ক্রমোন্নতি আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ল না। মনে হয় তিনি 'রৌদ্র-জ্যোৎস্নাতে' কালের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছেন। এতে কবির সৃষ্টির ঐশ্বর্যের দীনতা প্রকাশ পায়।

কিন্তু এই অসম্পূর্ণতাগুলি সত্ত্বেও 'আলোর আকাশ'কে বাংলা সাহিত্যের কাব্যক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলতে দ্বিধা নাই। প্রচ্ছদ সহজ এবং সুন্দর।

"সৈনিকের প্রাণবীণা" একটি আবেগদীপ্ত ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। খোলা তলোয়ারের মত কারুকার্যহীন কঠিন অথচ তীক্ষ্ণ কয়েকটি কবিতায় শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করছেন। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:—

বন্দি অস্থি—তান্ত্রিক রাজসিক
শশাংক থেকে সুভাষবসুর জীবনের জয়বলে,
বন্দি অতিমা তান্ত্রিক সাত্বিক
আদিনাথ হতে অরবিন্দের পরাণের তপোফলে।
পিতৃকুলের পুণ্যপুরীতে প্রাণ নহে শংকিত
বন্দিভূমিতে জীবনমন্ত্র নিত্য উচ্চারিত— (সাতই মে)

কবিতাগুলি সবই প্রায় এই ধরণের নিপুণ ছন্দোবদ্ধ এবং অবেগপূর্ণ। কিন্তু এই দুটি গুণের কোনটাই মহৎ কবিতা হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কবিতা আরও কিছু সে রসের পুজারী। আবেগ থেকে রসের স্তরে উত্তরণ, সার্থক কবিতা বিচারের মানদণ্ড। আলোচ্য কবিতাগুলি সাধারণভাবে ভালো লাগলেও, পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ নিয়ে আসে না। আনন্দ দেবার চেয়ে কোলাহলের প্রতি যেন কবিতাগুলির ঝোঁক বেশি। তবু এই কাব্যগ্রন্থের বলিষ্ঠ প্রকাশ ভংগীটি ভাল লেগেছে।

নীলপাতা—একটি কাঁচা হাতের লেখা কাব্যগ্রন্থ। ছন্দ অত্যন্ত শিথিল, ভাব অস্পষ্ট, অপরিণত। তবে কবি মনের স্পর্শ মাঝে মাঝে পাই—এইটুকু তৃপ্তি নিয়েই সমালোককে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। যেমন:—

"আর এক নিবিড় আঁধার এসে
বুকে তার বারে বারে তোমারেই ঢেকে রেখে
ভালবাসে;
যতদিন ভালবাসি আমি। ('বনেরলতা')

অবশ্য এই ধরণের পদ্যাংশ খুব বেশি নেই। দীর্ঘদিন অনুশীলন করলে কবিতার ক্ষেত্রে উন্নতির আশা করা যায়।

কাব্য কাহিনী—'মহাকবি মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্ত,' 'শ্বেতাঙ্গিণী,' 'রামের প্রতি সীতা' 'শিবের প্রতি সতী,' 'নরনারী' 'মণিক্ষীর মনোবেদনা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি একেবারে পুরনো ধাঁচের। তাতেও ক্ষতি ছিল না যদি তার মধ্যে ব্যঞ্জনা এবং রসের সন্ধান পেতাম। ছন্দ অত্যন্ত শিথিল, কবিতাগুলির আবেদন অল্পই।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ ॥ পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ২৫। 'সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ মিত্র ৩০। মুক্তধারা। গোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৩। ব্রহ্মসভা না ব্রহ্মসমাজ। সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৩৭। আজি মম জন্মদিন। সোমেন বসু ৫৬। মুক্তিসাধক সত্যেন বসু। সোম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৫। রাষ্ট্রভাষা সমস্যা। সনৎকুমার রায় চৌধুরী ১০৯। বাংলার সারিগান। জয়দেব রায় ১২৪। হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা। সোমেন বসু ১৬১। যুগ-মানস। সনৎকুমার রায় চৌধুরী ১৭৩ ঊনিশ শতকী জাগরণ এবং একটি বিতর্ক। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২১৭। রবীন্দ্রনাথের কবিমানস। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ২২১। হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা। সোমেন বসু ২৩৭। কলমের স্বাধীনতা ও মিল্টন। মুরারি ঘোষ ২৭৩। সানাই। সোমেন বসু ২৭৯। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু পত্রিকা। অণিমা সেন ২৯৮। বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। বিনয় ঘোষ ৩৪৫। ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর মূর্তি-কল্পনা। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৫১। ভারতীয় দর্শনে যুক্তিবিচারের স্থান। রমা চৌধুরী ৩৫৯। ইবসেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৩। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। রতন সান্যাল ৩৭২। বিংশ শতাব্দীর চেতনায় গণতন্ত্র। অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৩৮১। ডৈরোজিয়, রামমোহন ও বিপ্লব। যোগানন্দ দাস ৩৮৭। বিশ্বপথিক বাঙালী কবি। শিশিরকুমার দাশ ৪২৫। ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ-মন। অলোক রায় ৪৩১। শিল্পকলা ও তার প্রতিরূপায়ন। মীরা দত্ত ৪৩৯। উত্তর বঙ্গের একটি প্রাচীন পুথি। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮১। জগদীশচন্দ্রের কবিতা। মুরারি ঘোষ ৪৯৪। রূপকথা ও অবনীন্দ্রনাথ। অণিমা সেন ৪৯৯। ডেভিড রিকার্ডো। মঞ্জুলা বসু ৫৩৭। অপ্রকাশিত পদাবলী। অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী ৫৫১। ঠাকুর বাড়ীর ইতিকথা। অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৫৪৩। বৈষ্ণবকাব্যে মিষ্টিসিজম। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫৯৫। গদ্য কবিতার ছন্দ-প্রসঙ্গ। নীলরতন সেন ৬০০। বীরবলী সনেট। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৬০৬। মাধব কন্দলীর রামায়ণ। সোমেন বসু ৬৫১। দ্রষ্টা জগদীশচন্দ্র। সনৎকুমার রায় চৌধুরী ৬৫৭। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনজিজ্ঞাসা। ভবানীগোপাল সান্যাল ৬৬০। পদাবলীর চিত্রকল্প। রণেন্দ্রনাথ দেব ৭০৮। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। শিবেন্দ্রদুলাল নাথ ৭২৮। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরেন ঘোষ ৭৩৯।

কবিতা ॥ শরভীতু। রাধারমণ প্রামাণিক ১৩৮। কী কথা সে বলে যাবে। গৌরীশঙ্কর দে ১৩৯। স্বরগ্রাম। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩। জীবন-জিজ্ঞাসা। উৎপল চৌধুরী ১৯৪। ছায়া-ছবি। রমাপ্রসাদ দে ২৪৮। বাদাম গাছের নীচে। সুনীল বসু ২৪৯। বরাকরের সধ্যা। বুদ্ধদেব ঘটক ৩০৯। একটি চিন্তা। সন্তোষ চক্রবর্তী ৩১০। অনুবাদ কবিতা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭৮। অনুবাদ কবিতা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬৯। প্রেম। শিবশম্ভু পাল ৪৬০। নূপুর। কৃষ্ণ দাশ ৫৬৮। সুনীল সমারোহ। সন্তোষ দাস ৫৬৭। দ্বীপান্তর। বিনয় হাজরা ৬৭৯। ঝরণা বেগম। সামসুল হক ৬৮০।

অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৭১, ১১৮, ১৬৮, ২৩১, ২৯২, ৩৯৭, ৪৪৪, ৫১১, ৫৬৯, ৬২৪, ৬৮১, ৭২২।

উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯, ১৮৩, ২৪২, ৩০১, ৪৪৯, ৫০৩, ৫৫৯, ৬১৬, ৬৭১, ৭৩৩।

আলোচনা ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। রাখাল ভট্টাচার্য ৮৩। শেষের কবিতায় প্রেম। মীরা দত্ত ৮১। সময় নেই। শঙ্কর গুপ্ত ১৪০। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। সন্তোষকুমার অধিকারী ১৪৩। সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ। দুর্গাদাস সরকার ১৯৫। বিষয় বনাম ভাষা। অশোক ঘোষ ২৫০। গ্রামের দিকে। পবিত্র পাল ২৫২। সমালোচনা। দীপক রুদ্র ২৫৪। ছোট গল্পের সংকট। হরেন ঘোষ ৩১১। বাংলা বাংলা শিক্ষা সমস্যা। অশোক ঘোষ ৪০৫। বাংলা কাব্য সাহিত্যে নাগরিকতা। দুর্গাদাস সরকার ৪০৮। বাঙালীর প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব। সলিলপ্রসাদ ঘোষ ৪৬১। 'কবিরে খুঁজোনা তাঁহার জীবন চরিতে'। অমল চক্রবর্তী ৫৭৪। বরিস পাস্তেরনাক। হরেন ঘোষ ৬৩০। নীতি ও রাজনীতি। উৎপল চৌধুরী ৬৩২। সমাক। শঙ্কর গুপ্ত ৬৮৫। মোহিতলালের ছন্দ। প্রফুল্লকুমার দত্ত ৬৮৮। বাংলার ইতিহাস। সোমেন বসু ৭৪২। মার্কিণ ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী। নির্মলেন্দু সান্যাল ৭৪৩।

গল্প ॥ পরবাসী। মানসী দাশগুপ্ত ৭৪।

সমালোচনা ॥ গীতিগুচ্ছ। রথীন্দ্রনাথ রায় ৯৪। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী। পুরাতনী। সোমেন বসু ১৪৭। ইতিহাসের মুক্তি * বাংলার নবাসংস্কৃতি * সাহিত্য পাঠের ভূমিকা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২০৬। বিদ্রোহে বাঙালী বা আমার জীবন চরিত। সোমেন বসু ২০৮। সাহিত্য ও সংস্কৃতি * শবরী। সরিৎশেখর মজুমদার ২৬১। ইংরেজের দেশে। অশোক ভট্টাচার্য ২৬২। বিদেশ বিভূই। রাণা বসু ৩১৫। আজকের পশ্চিম। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩১৬। সামনে চড়াই। মঞ্জুলিকা বসু ৩১৭। কবিগান ও কবিওয়ালা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪১৩। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। হরেন ঘোষ ৪১৫। আমেরিকার সাহিত্য জগৎ। মুরারি ঘোষ ৪৬৯। উনবিং শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য। মঞ্জুলিকা বসু ৪৭১। অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সমস্যা। নিরঞ্জন হালদার ৫২২। একালের চোখে। অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৫২৪। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। বীরেন্দ্র মিত্র ৫২৫। **Declaration**। প্রণবকুমার বর্ধন ৫৮০। **Undeveloped Areas** নিরঞ্জন হালদার ৫৮১। বান ও বন্যা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫৮৩। চৈত্রের পলাশ ও মায়াবতী মেঘ। অশোক ভট্টাচার্য ৬৭৩। স্বপ্ন ও সাধনা। উৎপল চৌধুরী ৬৩৮। কালের বিচার। করেন ঘোষ ৬৩৮। মিশ্চিমন। গুরুদাস ভট্টাচার্য ৬৩৯। নিরঞ্জন হালদার ৬৯৪। রথীন্দ্রনাথ রায় ৭৪৮। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৭৫০।

সমাজ সমস্যা ॥ পরাভূত রবীন্দ্রনাথ * উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে * উপেক্ষিত ভিত্তি * অধিক উৎপাদন ও সুসম বন্টন * বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রমনস্কতা। সুব্রতেশ ঘোষ ৮৮, ১৪৫, ২০৩, ৪১০। অরাজনৈতিক। সোমেন বসু ৪৬৬। রাষ্ট্রমনস্কতা, রাজনীতি ও অতি-রাজনৈতিকতা। সুব্রতেশ ঘোষ ৫১৬। গোড়ায় গলদ। সুব্রতেশ ঘোষ ৫৭৬। রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি। নিরঞ্জন হালদার ৬৩৪। বিকেলের আলো। অচিন্ত্যেশ ঘোষ। ৭৪৬।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ বালুচর শাড়ি। কল্যাণ দাশগুপ্ত ৯২। আধুনিক চিত্রকলা। মীরা দত্ত ১১৯। 'সৌমিত্র সংঘ'-এর দুইপুরুষ। অমিতা চৌধুরী ২০২। সাধারণ রঙ্গালয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৩। সংগীতের বিবর্তন ও বাদ্যযন্ত্র। গোপীনাথ গোস্বামী ৪০১। বাংলা সাহিত্য ও অনুবাদ। হরেন ঘোষ ৪৬৩। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। হীরেন বসু ৫২০।

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত